KALIKATA LITTLE MAGAZINE LIBRARY-O-GABESHANA KENDRA
18/M TAMER LANE, KOLKATA-700009

Record No. : KLMLGK 2007	Place of Publication : ২৪, চৌরঙ্গী রোড, কলকাতা ১৩
Collection : KLMLGK	Publisher : আনন্দগোপাল সেনগুপ্ত
Title : সমকালীন (SAMAKALIN)	Size : 7"x9.5" 17.78x 24.13 c.m.
Vol. & Number : ৭/- ৭/- ৭/- ৭/- ৭/-	Year of Publication : জ্যৈষ্ঠ, ১৩৬৬ আষাঢ়, ১৩৬৬ শ্রাবণ, ১৩৬৬ ভাদ্র, ১৩৬৬ আশ্বিন, ১৩৬৬
	Condition : Brittle / Good ✓
Editor : আনন্দগোপাল সেনগুপ্ত	Remarks :

C.D. Roll No. : KLMLGK

এনামেলের বাসন

- দামে সস্তা
- ভারে লঘু
- ব্যবহারে টেঁকসই
- বিজ্ঞানসম্মত ও স্বাস্থ্যকর

সেরামিক সেলস্ করপোরেশন লিঃ

২৪ চিত্তরঞ্জন এভিন্যু, কলিকাতা-১২

সম্পাদক। আনন্দগোপাল সেনগুপ্ত

সমকালীন

সপ্তম বর্ষ ॥ ভাদ্র ১৩৬৬

কলিকাতা লিটল ম্যাগাজিন
ও
গবেষণা কেন্দ্র
৮৮/এম, ট্যামার লেন, কলকাতা-৭০০০০৯

এই বিজ্ঞাপনটি পড়তে আপনার কতক্ষণ লাগবে?

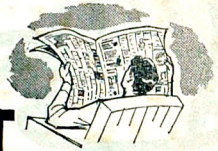

আপনি পড়া শুরু করেছেন কী অমনি সারা ভারতবর্ষে
কমকরেও ৫,০০০ লোক তাদের প্রিয় সিগারেট্
'সিজার্স' ধরিয়ে ফেলেছেন।

এক মিনিটের মধ্যে আরও ৫,০০০ লোক সে দলে যোগ দেবেন।

এখন, আপনি নিজে একটি 'সিজার্স' সিগারেট্ ধরান।
সিগারেটটি শেষ হওয়ার আগেই প্রায় ৫০,০০০
লোক আপনারই মত সিজার্স-এর ধূমপানে মসগুল থাকবেন।

ভাবিয়ে তুললে, তাই না? তবে শুনুন, 'সিজার্স'
সিগারেটের জনপ্রিয়তা অতুলনীয় হয়ে রয়েছে
৪৫ বছরেরও বেশী, কারণ, সিগারেট্টা সত্যিই ভালো।

উইল্‌স-এর
সিজার্স

সিগারেট্টা ভালো — সেইটাই আসল কথা

১০টির দাম ৩০ নয়া পয়সা

দি ইম্পিরিয়াল টোব্যাকো কোম্পানী অফ ইণ্ডিয়া লিমিটেড কর্তৃক প্রচারিত

সমকালীন

ভাদ্র ॥ সপ্তম বর্ষ ॥ ১৩৬৬

॥ সূচীপত্র ॥

অব্যক্ত গণিতে : গ্রীস ও ভারত ॥ মুরারি ঘোষ ২১১

রবীন্দ্রনাথ ও পত্রপুট ॥ সাধনা সরকার ২৭৯

জাতীয় নাট্যশালা প্রসঙ্গে ॥ রাখাল ভট্টাচার্য ২৮৫

প্রাচীন ভারতের সাধনা ও 'তপতী' ॥ ভারতী সেনগুপ্ত ২৮৯

সান্নিধ্য ॥ চিন্তামণি কর ২৯৩

এক ছিল কন্যা ॥ স্বরাজ বন্দ্যোপাধ্যায় ২৯৮

মেঘনাদবধ-কাব্যে জীবনস্মৃতি ॥ বিমলাকান্ত মুখোপাধ্যায় ৩০৩

বাঙলা প্রেম-কবিতার প্রথম পর্যায় ॥ হরেন ঘোষ ৩০৭

লঘিষ্ঠ ॥ শংকর গুপ্ত ৩১০

সমালোচনা—উষারঞ্জন মুখোপাধ্যায় ৩১৩

॥ সম্পাদক : আনন্দগোপাল সেনগুপ্ত ॥

আনন্দগোপাল সেনগুপ্ত কর্তৃক মডার্ন ইণ্ডিয়া প্রেস ৭ ওয়েলিংটন স্কোয়ার
হইতে মুদ্রিত ও ২৪ চৌরঙ্গী রোড্ কলিকাতা-১৩ হইতে প্রকাশিত।

নতুনের অভিযান...

দিকে দিকে আজ নতুনের অভিযান—নবীন
শিশুর আত্মপ্রকাশের ক্রন্দন বয়ে নিয়ে আসে নতুনের সংকেত,
সাড়া জাগে লক্ষ মানুষের প্রাণে, তারা জেগে ওঠে, চেষ্টা
দিয়ে, কর্ম দিয়ে জাতিকে তারা নতুন করে গড়বেই.....মহৎ
কাজের প্রচেষ্টা থেকেই একদিন শ্রান্তিমর,
ক্লান্তিময় পৃথিবীতে আনন্দ আর সুখ উৎসারিত হবে।
বৈচিত্র আর অভিনবত্ব জীবনকে করে তুলবে সুন্দরতর।
কালের জড়তা ভুলে অতীতের এক মহান
জাতিও আজ তাই জেগেছে, পেয়েছে সে নতুনের আস্বাদ.....

আজ সমৃদ্ধির গৌরবে আমাদের পণ্যদ্রব্য এ দেশের সমগ্র পারিবারিক পরিবেশকে পরিচ্ছন্ন, সুস্থ ও সুখী করে রেখেছে। তবুও আমাদের প্রচেষ্টা এগিয়ে চলেছে আগামীর পথে—সুন্দরতর জীবন মানের প্রয়োজনে মানুষের চেষ্টার সাথে সাথে চাহিদাও বেড়ে যাবে। সে দিনের সে বিরাট চাহিদা মেটাতে আমরাও সদাই প্রস্তুত রয়েছি আমাদের নতুন মত, নতুন পথ আর নতুন পণ্য নিয়ে।

আজও আগামীতেও...দশের সেবায় হিন্দুস্থান লিভার

PR 2-X52 BG

স ম কা লী ন
স প্ত ম ব র্ষ
ভাদ্র । ১ ৩ ৬ ৬

অব্যক্ত গণিতেঃ গ্রীস ও ভারত

মুরারি ঘোষ

উপনিষদের ঋষি সেই কবে প্রার্থনা করেছিলেন ঃ"অন্ধকার হতে আলোকের পথে নিয়ে চলো"। বিশ্বের গণিতশাস্ত্রের প্রাচীনতম পুঁথিতে অন্ধকার থেকে আলোকে যাওয়ার এক পথ বিবৃত আছে (আহ্‌মোস্‌ প্যাপীরাস শীটের ইংরাজি নাম ঃ Direction for knowing all dark things)। মোট ৮৫টি গাণিতিক প্রশ্ন আর তার সমাধান নিয়ে মিশরীয় লেখক আহ্‌মোস্‌ রচিত ১৮ ফুট লম্বা আর ১৩ ইঞ্চি চওড়া এক প্যাপীরাস শীটে লেখা পুঁথিবীর এই প্রাচীনতম গণিতের পুঁথি। সম্ভবতঃ খৃ. পূ. ১৭০০ সালে এর রচনা। তবে পণ্ডিতেরা বলেন যে এর অংক-গুলো নাকি আরো দুহাজার বছর আগে থেকে মিশরে প্রচলিত ছিল। অন্ধকার থেকে আলোকের পথে যাওয়ার আহ্‌মোস্‌ বর্ণিত উপায় আমাদের দেশেও স্বীকৃত। প্রাচীন ভারতে বীজগণিতের অন্য এক নাম, অব্যক্তগণিত। অজ্ঞাত রাশির প্রতীক মালায় গঠিত বিভিন্ন ধরণের গাণিতিক সমাধান যার দ্বারা সম্ভব তাকেই বলা হয় অব্যক্ত গণিত। তাই পাটীগণিতের অন্য নাম ছিল ব্যক্ত গণিত। নারায়ণাচার্য্য (১৩৫০) বলেছেন, "যেমন সেই পরমগুরুদের মধ্য থেকে এই সমগ্র দৃশ্যমান ও সীমাহীন বিশ্ব নির্মিত তেমনি বীজগণিত থেকে পাটীগণিত তার সমস্ত সূত্রাবলী সমেত উদ্ভূত হয়েছে" (হিস্ট্রি অব হিন্দু ম্যাথামেটিক্স ঃ বিভূতিভূষণ দত্ত।) দ্বিতীয় ভাস্করাচার্য আরো এগিয়ে গেছেন। বীজগণিত পরিগণনাকে অনেক উচ্চতে স্থান দিয়েছেন তিনি। দৃষ্টির অতীত সর্বশক্তিমান ঈশ্বরের সংগে তুলনা দিয়েছেন অজ্ঞাত সংখ্যাদের পরিগণনা-বিজ্ঞানকে।

সেই প্রাচীনকাল থেকেই বীজগণিত, পাটীগণিতের বিষয়গত ও গুণগত পার্থক্য ধরা পড়েছিল ভারতীয় গণিতজ্ঞদের কাছে। বিশেষ করে দ্বিতীয় ভাস্করাচার্য বীজগণিতকে কেন্দ্র করে ইতস্ততঃ মূল্যবান মন্তব্যে এক সংক্ষিপ্ত গণিতদর্শন গড়ে তুলেছিলেন। তিনিই প্রথম উচ্চারণ করেছিলেন ঃ অব্যক্ত গণিতের নিয়মে ব্যক্ত গণিত প্রতিষ্ঠিত (ব্যক্তমব্যক্তবীজং)। ভাস্করাচার্যের পূর্বেই ভারতে বীজগণিতের সম্প্রসারণ লক্ষণীয়। তাই পূর্বগামী মনীষীদের যোগ্য সমাদর দিয়ে তিনি বলেছিলেন যে, "স্বল্পবুদ্ধি মানুষদের বুদ্ধি বিকাশের সহায়তায় প্রাচীন ঋষিগণ বীজগণিতের প্রতিষ্ঠা করেন। সূর্য যেমন শতদলের পাপড়ি-বন্ধন উন্মোচন করে—বীজগণিতও তেমনি নির্বুদ্ধির নাগপাশ ছিন্ন করে দেয়।" দুরকম উপায়ে বীজগণিতের

আর্কিক সূত্র প্রকাশ করতে পারা যায় বলে তিনি উল্লেখ করেছিলেন। এক : রেখাংকনে, দুই : রাশিবিদ্যায়। ভারতীয় মন বিশ্লেষণ ধর্মী। শিল্প-সাহিত্য-দর্শনে এই বিশ্লেষণ মানসিকতার চূড়ান্ত রয়েছে। তাই রেখাংকনে বা জ্যামিতিবিদ্যায় বিশ্লেষণ টেনে এনে বীজগণিতীয় সূত্রেও কোথাও কোথাও জ্যামিতির গাণিতিক সমাধান বাস্ত হয়েছে (যেমন : বৌধায়ন কর্তৃক নির্দিষ্ট বৃত্তের সমক্ষেত্রফল বিশিষ্ট বর্গক্ষেত্র গঠন)। এর ঠিক উল্টোটাই হোল গ্রীকমানস। তারা বীজগণিতকে জ্যামিতি করেছে। সংখ্যাকে রূপায়িত করেছে রেখাচিত্রে ("....the Greek of his [Euclid] time usually thought of quantities in terms of lengths and areas."—Sir James Jeans : The Growth of Physical Science.)। শিল্পে দর্শনে বিজ্ঞানে ভারতবর্ষ গেছে রূপ থেকে অরূপে—গ্রীকেরা অরূপের আভাস এনেছে রূপের আখরে। গ্রীক গণিত আর ভারতীয় গণিতের বিকাশ ধারার আলোচনায় দুই দেশের দুই মেরু-ধর্মের বিস্তার পরে বিবৃত করছি।

পৃথিবীর আদিমতম বীজগণিতের অংক হোল : কেমন করে পূর্ণ ও তার এক সপ্তমাংশের যোগফল হবে উনিশ (Hau, its whole, its seventh, it makes nineteen : Hau হোল মিশরীয় ভাষায় অজ্ঞাত কোনো পূর্ণ রাশি)। আধুনিক বীজগণিতে ভাষান্তরিত করলে যা দাঁড়ায় :

$x + \frac{x}{7}$ 19 এর সমাধান : $\frac{7x + x}{7} = 19$

বা $8x = 19 \times 7$ বা $x = 16\frac{5}{8}$

সাম্প্রতিক গণিতের সূত্রে এর সমাধানে একমিনিটও লাগে না। কিন্তু অনেক কষ্টসাধ্য পদ্ধতি অনুসরণ করে এর সমাধান হয়েছে মিশরীয় প্যাপীরাসে, প্যাপীরাসের অনেকখানি স্থান দখল করেছে এর সমাধান-পর্ব। অজ্ঞাত কোন রাশি নিয়ে অংকের সমাধান আজ সহজ হয়েছে বীজগণিতীয় প্রতীক ও তাদের সরল ব্যবহারিক সূত্রে। এই প্রতীক ব্যবহারের প্রথম উদ্ভাবক হলেন ডায়োফেণ্টাস (২৭৫ এ.ডি.)। অজ্ঞাত সংখ্যা প্রকাশের জন্যে ব্যবহৃত শব্দের আদি অক্ষর বসিয়ে ডায়োফেণ্টাস প্রথম বিভিন্ন অজ্ঞাত সংখ্যার প্রতীক সৃষ্টি করলেন। এ ধরণের সরল প্রতীক ব্যবহার স্বতন্ত্র ও স্বাধীনভাবেই ঠিক পরের যুগে হিন্দু গণিতেও দেখা গিয়েছে। ডায়োফেণ্টাসের অনেক পূর্বে রচিত "বখশালি পুথিতে যে অনির্ণেয় সমীকরণের অংক রয়েছে তাতেও অজ্ঞাত রাশির যুক্ত উদাহরণ আছে। কিন্তু এ সমস্ত অংকে অজ্ঞাত রাশিদের স্থানে শূন্য বসিয়ে (০) তাদের অস্তিত্ব বোঝাতে হয়েছে। আসলে শূন্য ওখানে কোন অজ্ঞাত রাশির প্রতীক নয়, এক্ষেত্রে ওদের ব্যবহার কেবলমাত্র পরিচিত রাশির অভাব বলেই। শূন্য স্থান বলতে বখশালি পুথির অংকে বোঝায় কোন বিশেষ অজ্ঞাত রাশির স্থান। এই নিয়মের অনুসরণ পরের যুগেও কোন কোন ভারতীয় গণিতজ্ঞের (শ্রীধরাচার্য : ৭৫০ খৃষ্টাব্দ) পাওয়া যায়।

প্রথম প্রতীকের সন্ধান ডায়োফেণ্টাস অবশ্যই দিয়েছিলেন। প্রতীকের ব্যবহার সহজ সরল না হলে বীজগণিত সম্প্রসারণ অসম্ভব। এর সব চেয়ে জটিল উদাহরণ মিশরীয় গণিতেই পাবো, সহজ বীজগণিতীয় প্রশ্নের জটিলতা সমাধানে। পাবো প্রাচীন গ্রীক ও হিন্দু গণিতেও। যথেষ্ট চর্চা অবশেষে ভারতীয় গণিতে প্রতীকের উদ্ভাবনা সহজ করে এনেছিল। শূন্য দিয়ে অজ্ঞাত রাশির স্থান বোঝানোর জটিলতা প্রথম মুক্তি পেল "পৃথুকস্বামীর" ব্রহ্মগুপ্তের টীকায়। গণিতের ইতিহাসকার অধ্যাপক বিভূতিভূষণ দত্তের মতে ব্রহ্মগুপ্তের সময় থেকেই বীজগণিতীয় প্রতীকের ব্যবহার সুরু হয়েছিল ভারতবর্ষে। "শ্যাবৎ তাবৎ" শব্দ দিয়ে অধিকাংশ সময়েই অজ্ঞাত সংখ্যা বোঝানো যেত। পরে আরো সরল করে নিয়ে কেবল "শ্যাবৎ" এর

"শ্য" বর্ণের প্রতীক ব্যবহারেই অজ্ঞাতসংখ্যা বোঝানো হোত। তাছাড়াও অংকে বিভিন্ন অজ্ঞাত রাশি থাকলে বিভিন্ন বর্ণ বা রঙের আদ্যাক্ষর প্রতীক হিসেবে ব্যবহার হোত : যথা

যাবৎ তাবৎ = যা, কালো = কা, নীল = নী, পীত = পী, লোহিত = লো, হরিৎ = হ, শ্বেত = শ্বে, রূপ = রূ। পৃথুকস্বামীর কয়েকটা সমীকরণ উদাহরণস্বরূপ তুলে দিলে হয়তো ব্যাপারটা পরিষ্কার হবে। যথা,

যা ১৯৭ কা ১৬৪৪ নী ১ রূ ৩

যা ০ কা ০ নী ০ রূ ৬৩০২

আধুনিক বীজগণিতের পরিভাষায় x, y ও z বসিয়ে এই সমীকরণ দাঁড়াবে :

$197x - 1644y - Z + O = Ox + Oy + Oz + 6302$

কিংবা দ্বিতীয় ভাস্করাচার্য্যের উদাহরণ

যা ৫ কা ৪ নী ৭ রূ ৯০

যা ৭ কা ৯ নী ৬ রূ ৬২

বর্তমান বীজগণিতে দাঁড়াবে এই আকারে :

$5x + 4y + 7z + 90 = 7x + 9y + 6z = 62$

উপযুক্ত প্রতীকের অভাবে এবং সীমায়িত ক্ষেত্রের মধ্যে চলাফেরা করে যতখানি সম্প্রসারণ ভারতীয় বীজগণিতে হয়েছে তা আধুনিক গণিতের বিস্ময়। অনেক উন্নত হওয়া সত্ত্বেও ভারতীয় বীজগণিতকে আধুনিক গণিত বলা যাবেনা কেন তার কারণ পরে বিবৃত করছি। সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ঘটনা এই যে মধ্যযুগে ভারতের প্রায় প্রত্যেক গণিতজ্ঞই—বখশালি পুথির রচয়িতা (অজ্ঞাত) থেকে আরম্ভ করে চতুর্দশশতকের নারায়ণাচার্য অবধি প্রত্যেকেই বীজগণিত শাস্ত্রে কিছুনা কিছু মৌলিক অবদান ছড়িয়ে গেছেন। নীচের তালিকাটি বীজগণিতের উল্লেখযোগ্য কীর্তিকাহিনীর সন্ধান দেবে :

প্রায়	২০০ খৃ. পূ.	: রচয়িতা অজ্ঞাত	:	বখশালি পুথি,
	৪৭৬ খৃষ্টাব্দ	: আর্যভট	(১ম) :	আর্যভটীয়,
	৫২২ ,,	: ভাস্করাচার্য	(১ম) :	মহাভাস্করীয় ও লঘুভাস্করীয়,
	৬২৮ ,,	: ব্রহ্ম গুপ্ত	:	ব্রহ্মস্ফুট সিদ্ধান্ত ও খণ্ড খাদ্যক,
	৭৫০ ,,	: শ্রীধর	:	ত্রিশতিকা,
	৮৫০ ,,	: মহাবীর	:	গণিত-সার-সংগ্রহ,
	৮৬০ ,,	: পৃথুকস্বামী	:	ব্রহ্মস্ফুট সিদ্ধান্ত টীকা,
	৯৫০ ,,	: আর্য্যভট	(২য়) :	মহাসিদ্ধান্ত,
	১০৩৯ ,,	: শ্রীপতি	:	সিদ্ধান্তশেখর ও গণিত-তিলক,
	১১৫০ ,,	: ভাস্করাচার্য্য	(২য়) :	বীজগণিত, লীলাবতী করণ কুতূহল ও সিদ্ধান্ত শিরোমণি,
	১৩৫০ ,,	: নারায়ণাচার্য	:	গণিত কৌমুদী।

এঁদের মধ্যে বিশেষ করে আর্য্যভট (১ম), ব্রহ্মগুপ্ত ও দ্বিতীয় ভাস্করাচার্য্যের প্রতিভা বিস্ময়কর। বিশেষ করে ভাস্করাচার্য্যের অনেক গবেষণার ফল সপ্তদশ শতাব্দীর ইউরোপে নতুন করে আবিষ্কৃত হয়েছে। মেয়েরিয়াক, ফার্মাট, অয়লার, লাগ্রাঞ্জ, এদের মারফৎ। ভারতীয় বীজ-

গণিতের এই অগ্রগতি কিন্তু এক নির্দিষ্ট সীমায় এসে থেমে গিয়েছিল। দ্বিতীয় ভাস্করাচার্যই প্রাচীন ভারতীয় গণিতের মহত্তম প্রজ্ঞা। সীমাবদ্ধ ক্ষেত্র আর অসংস্কৃত প্রতীকের জটিলতর প্রয়োগের মধ্যেই তাঁর প্রতিভা আধুনিক গণিতের অনেক কিছু ফলশ্রুতি লাভ করেছিল। তবু তিনি আধুনিক বীজগণিতের জন্মদাতা নন। জন্মদাতা গ্রীক গণিতজ্ঞ ডায়োফেণ্টাসও নন। উন্নততর ও সরল প্রতীকের উদ্ভাবনা না হওয়া পর্যন্ত আধুনিক বীজগণিতের আবির্ভাব সম্ভব ছিলনা। সম্ভব ছিলনা জটিলতর প্রতীকের সীমারেখার মধ্যে তৃতীয় কোন ভাস্করাচার্যের আবির্ভাবের।

কোলব্রুক বলেছেন গ্রীক গণিতের যেখানে শেষ ভারতীয় গণিতের সুরু সেখান থেকেই। এর মানে এই নয় যে গ্রীক গণিত ভারতীয় গণিতের জন্মদাতা। কিন্তু আমাদের দুর্ভাগ্য যে শুধু এই অর্থটাই অনেক গণিত ইতিহাসকার, যথেষ্ট প্রমাণাভাব সত্ত্বেও, প্রচারে উচ্চকণ্ঠ। বীজগণিত নিয়েই এই বিতর্কের সুরু (কেননা ভারতীয় প্রজ্ঞা গণিতের উত্তুংগ শিখর লাভ করেছে বীজগণিতেই)।

বীজগণিতের আদি ইতিহাসে ভারতীয় ও গ্রীক গণিত পাশাপাশি রেখে বিচার করা চলে। গ্রীক বীজগণিতের সুরু করতে গিয়ে সবচেয়ে মূল্যবান মন্তব্য স্মরণ করতে হয় ইউজিন স্মিথের।

The Greek mind turn to the Science of form rather than to that of number, and consequently but few evidences of algebra are found in Greece during the golden age of philosophy. Whenever a need for algebra is met it is always for the solution of some geometric problems, and whenever a solution is effected it is usually by some device involving geometry (Encyclopaedia Americana)

গ্রীসে বীজগণিত বিকাশের সবচেয়ে বড় অসুবিধে তার সহজ সংখ্যাবিজ্ঞানের অভাব। গ্রীক বর্ণমালার সংখ্যারূপ প্রাথমিক গণিতের জটিলতা থেকে মুক্তি আনে নি, উপরন্তু বেঁধে দিয়েছে বিন্দু-রেখা-ক্ষেত্রের বাঁধনে। রেখার জগতে বিস্তৃত হয়েছে গ্রীকমালা। ভাবের গভীরে প্রবেশ করে করে ভাবনায় দৃশ্যমান রূপলোক গঠনই গ্রীক চিন্তার বৈশিষ্ট্য। গ্রীসে তাই জ্যামিতির প্রয়োজনেই বীজগণিতকে খুঁজে বার করতে হয়েছে। বীজগণিত এসেছে সংখ্যার নিয়মে নয়, ইউক্লিডের প্রয়োজনে। জ্যামিতিক সমাধানেই বীজগণিতের সূত্র সন্ধান। অগত্যা গ্রীক বীজগণিতের সীমারেখা বর্দ্ধিত হতে পারে নি। মোটামুটি জ্যামিতি-নির্ভর তার অস্তিত্ব। এহেন সীমায় জ্যামিতি ছাড়িয়ে তার স্বাধীন সম্প্রসারণ অনেক দুরূহত্ব ছিল। মিশর থেকে বীজগণিত আমদানী হয়েছে গ্রীসে তার সাক্ষ্য দিয়েছে প্লেটো। ডায়োফেণ্টাসের অনেক আগেই প্লেটোর উল্লেখ থেকে জানতে পারি গ্রীক গণিতের অনির্ণেয় সমীকরণের সমাধান। কোলব্রুক কথিত বীজ গণিতীয় সমীকরণের জনক ডায়োফেণ্টাস নন। প্লেটোরও আগে পীথাগোরীয় শিষ্যরাও সাধারণ বীজগণিত সমীকরণের সমাধান জানতো। তবু প্রাচীন গ্রীক বীজগণিতের একমাত্র ব্যক্তি বলেই ডায়োফেণ্টাসকে অভিহিত করা যায়। ডায়োফেণ্টাসই জ্যামিতির বাঁধন থেকে বীজগণিতকে মুক্ত করলেন। স্বতন্ত্র দেশে তাকে প্রতিষ্ঠিত করলেন শিক্ষাজগতের অন্যতম রাজ্য হিসেবে। বীজগণিত সমাধানে প্রতীকের সন্ধান দিলেন তিনি। অজস্র নির্ণেয় ও অনির্ণেয় সমীকরণের (ডেটারমিনেট ও ইনডেটারমিনেট ইকুয়েশন্‌স) সমাধান দিলেন। সংখ্যাবিজ্ঞানের কিছু কিছু বীজগণিতীয় প্রতিজ্ঞা (প্রপোজিশন) প্রতিষ্ঠা করলেন। গাণিতিক সীমার সম্নিকর্ষ সমাধানের (মেথড্ অব্ এ্যাপ্রক্‌সিমেট টু লিমিট) পথ বাতলালেন। গ্রীক বীজগণিতের পরমপুরুষ হলেন ডায়োফেণ্টাস।

ভারতে বীজগণিতীয় সূত্রের প্রথম সন্ধান পাওয়া যায় বৈদিক যুগে (প্রায় ২০০০ খৃঃ পূঃ)। শুল্ব সূত্রে সরলরৈখিক সমীকরণের (লিনিয়ার ইকুয়েশন্‌স্) যা উদাহরণ আছে আধুনিক গণিতের পরিভাষায় তা রূপান্তরিত হবে $ax=c^2$ আকারে। বিভিন্ন যজ্ঞবেদী নির্মাণে জ্যামিতিক অঞ্চলে যে সম্পাদ্যের উদ্ভব হোত তার অনেকের সমাধান বীজগণিতীয় সূত্রে করা আছে। শতপথ ব্রাহ্মণে এ ধরণের যজ্ঞবেদী নির্মাণ সমস্যার বীজগণিতীয় সমাধান রয়েছে। বখশালি পুঁথির বিবরণে বীজগণিতীয় সমীকরণের সুন্দর উদাহরণ পাওয়া যায়। স্থানাংগ সূত্রের বিবরণেও (জৈন ধর্মগ্রন্থ) এর যথেষ্ট উদাহরণ পাবো। ডায়োফাণ্টাসের অনেক আগে থেকেই বীজগণিতের স্বতন্ত্র শাস্ত্র গড়ে উঠেছিল। আর্যভটের (৪৭৬ খৃষ্টাব্দ) পূর্বে ভারতের এই গাণিতিক সম্প্রসারণে বিশেষ কোনো পণ্ডিতের উল্লেখ পাওয়া যায় না। বখশালি পুঁথির বিবরণ থেকে যা মনে হয় তা কোনো এক সংকলন গ্রন্থ মৌলিক পুস্তক নয়। কিন্তু এই সংকলন গ্রন্থে মূল গণিতজ্ঞদের কোন স্থানই নেই অথচ এক যথেষ্ট উন্নত বীজগণিত শাস্ত্রের আবির্ভাব আর্যভটের আগেই। বীজগণিতের তথাকথিত জনক (ব্রিটিশ স্কুলের মতে) ডায়োফাণ্টাসের সংগে এর কোনো সামান্যতম যোগাযোগ কল্পনা করতে পারা যায় না। কারণ তারও অন্তত ৫০০ বছর আগে ভারতীয় বীজগণিতের আংকিক সমস্যাবলী ভবিষ্যতের ডায়োফাণ্টাসের চিন্তাধারা থেকে অনেক এগিয়েছিল।

গণিতের ইতিহাসকারদের মোটামুটি দুটো চিন্তাধারায় ভাগকরা যায়। ব্রিটিশ স্কুল, আর জার্মান স্কুল। গণিতের উদ্ভাবনার ইতিহাস এঁরা দুই বিভিন্ন দিক দিয়ে বিবৃত করেছেন। ভারতের গণিতানুশীলনের মৌলিকত্ব স্বচ্ছন্দে স্বীকার করেছেন জার্মান স্কুল। শুধু পাটীগণিত বা সংখ্যাবিজ্ঞান নয় ভারতে বীজগণিত ও জ্যামিতির স্বতন্ত্র উদ্ভাবনার অন্যন্য পূর্বতা এঁরা অস্বীকার করেন না। ব্রিটিশ স্কুল কিন্তু ভিন্ন মত পোষণ করেন। Everything is Greek : তাঁদের বক্তব্যের সারমর্ম। দশমিক সংখ্যার প্রয়োগবিদ্যা বাদে গণিতের রাজ সিংহাসন তাঁরা গ্রীকদেরই দিয়েছেন। ভারতের প্রাচীন গণিতানুশীলনে ইংরেজী ইতিহাসের মুন্সিয়ানার বিরুদ্ধে যথেষ্ট অভিযোগ এ পর্যন্ত জড়ো হয়েছে। ভারতীয় গাণিতিক সূত্রের ভুল ব্যাখ্যায় সম্পূর্ণ জ্ঞাতসারেই ইচ্ছাকৃত বিকৃতির অনেক মারাত্মক অভিযোগ তুলে ধরা যায় ব্রিটিশ স্কুলের বিরুদ্ধে। অধ্যাপক ক্যাজোরী বা অধ্যাপক কায়নী, হেনরী টমাস কোলব্রুক, বা এরিক টেম্‌পল বেল ব্রিটিশ চিন্তাধারার অন্তর্গত। বি. এফ. থিবট, হেরমান হাঙ্কেল, কারপিনস্কি ও আমেরিকান ডেভিড ইউজিন স্মিথ—জার্মান চিন্তাধারার অন্তর্গত। গণিত ইতিহাসকার না হলেও জার্মান ভারততত্ত্ববিদ উইন্টারনিটজ ভারতীয় গণিতের স্বতন্ত্র উদ্ভাবনা ও বিকাশ মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করেছেন। যুক্তিতর্ক প্রয়োগের দু দলের দুটো উদাহরণ তুলে দেওয়া যাক। কোলব্রুক লিখেছেন :

"It must be admilled to be at least possible, in the absence of direct evidence and positive proof, that the imperfect algebra of the Greeks which had advanced in their hands no further than the solution of equations, involving one unknown term as it is taught by Diophantus, was made known to the Hindus by their Grecian instructors in improved astronomy". : (Algebra with Arithmetic of Brahmagupta and Bhaskar by H. T. Colebrooke).

Direct evidence এবং positive proof না থাকা সত্ত্বেও আমাদের ধরে নিতে হবে গ্রীকদের জ্যোতিষশাস্ত্রের মারফৎ ভারতে বীজগণিত আমদানী হয়েছিল। এ হোল ঐতিহাসিকের আবদার। আবার ঠিক এর বিপরীত কথা শুনতে পাবেন জার্মান গবেষকদের মুখে। হেরমান হাঙ্কেল বলেছেন :

Indeed if one understands by algebra, the applications of arithmetical operations to Complex magnitudes of all sorts, whether rational or irrational numbers or space magnitudes, then the learned Brahmins of Hindusthan are the real inventors of algebra.

ভারতের বীজগণিতের জন্ম ও প্রসারের ঐতিহাসিক সূত্রের সন্ধান দিয়েছেন হগ্‌বেন সাহেব। তিনি পরিস্কার বলেছেন যে গ্রীকদের সেই সামাজিক পটভূমিকা ও আবেগের অভাব ছিল। যা নাকি বীজগণিতের প্রসার সহজতর করে তুলতে পারে। কিন্তু হিন্দুদের অনুকূল সামাজিক আবেগ ও চেতনার সংগে গাণিতিক উপকরণও প্রস্তুত ছিল (The Greeks lacked the social impulse to develop an algebra. The Alexandrians felt the need and lacked the social equipment. The Hindus had the social equipment when the need arose) সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য হাতিয়ার যা বীজগণিতের আসল ধর্ম উদ্ধারে সাহায্য করেছে তা হোল পাটীগণিতের দশমিক প্রথা ও শূন্যের ব্যবহার। দশমিক সংখ্যার প্রচলনে ব্যাবাকসের বাঁধন থেকে হিসেবী মন মুক্তি পেল। কাঠের ব্যাবাকাস থেকে দশ আঙুলের ব্যাবাকাস সংখ্যাগণিতের প্রসার গণিত-চিন্তার প্রতীক প্রাধান্য এনে দিল। প্রতীকময়তা গণিতের ভাষাকে স্বল্পতা পরিসরে ভূমার সন্ধান দিতে পারে। গণিতের এই সংযত রূপ সব প্রথমে ধরা পড়লো বীজগীতানুশীলনে। বিশ্লেষণধর্মী মনে প্রতীকময় রূপারোপ অরূপের আভাস এনে দেয়। সহজ করে তোলে বিরাট উপলব্ধির মর্মকথা, বীজগণিতের ধর্মই এই যে সরল সূত্রের মারফৎ বহু জটিল গাণিতিক সমাধান সহজে মীমাংসিত হয়। এখানেই গ্রীক মানস আর ভারতীয় মানসের তফাৎ। দুজনে জ্ঞানরাজ্যের দুই মেরুপ্রান্তবাসী। অরূপের ইংগিত দিয়ে ভাস্করাচার্য গণিত-দর্শন গড়ে তুলেছিলেন। রূপের শক্ত কাঠামোয় গণিতকে বেঁধে দিয়েছিলেন ইউক্লিড। পাঁথগোরাসের অনেক আগেই তাঁর জ্যামিতিক উপপাদ্য বোধায়ন শ্রৌত কিংবা শতপথ ব্রাহ্মণে পাওয়া যাবে। বোধায়নের আবিষ্কারে এ কেবল উপলব্ধিই থেকে গিয়েছিল। কিন্তু পাঁথাগোরাস তাঁর উপলব্ধিকে রূপ, রেখা ও যুক্তির কাঠামোয় বেঁধে দিয়েছিলেন। আভাস নয় রূপালোক গঠনের বাস্তবতাই হোল গ্রীক গণিতের সারধর্ম। এ তফাৎ ধরতে না পারলে ভারতীয় ও গ্রীক গণিতের সাফল্য-বিচার সম্ভব হবে না। অধ্যাপক কীথের ভাষায় তা হোয়ে দাঁড়াবে অহেতুক পক্ষপাত ঃ

"To find an ultimate Greek Origin for these discoveries seems due rather to a party-pris than to justice".

দশমিক সংখ্যাবিজ্ঞান ছাড়াও বীজগণিত বিকাশে সহায়ক ছিল সরল সমীকরণ (Simple equation) আর সমান্তর ও গুণোত্তর শ্রেণীর চর্চা (Arithmetical and Geometrical Series)। সংখ্যাশ্রেণীর যোগফলের চর্চা বিস্তৃত ভাবে করেছিলেন আর্যভট। $1+2+3+4+\ldots$, $1+2^2+3^2+4^2+\ldots$, $1+2^3+3^3+4^3+\ldots$, এ রকম অনেক সংখ্যাশ্রেণীর যোগ এবং এদের যৌগিক ক্রিয়ার সাধারণ সূত্রের সন্ধানও তিনি দিতে পেরেছিলেন। আর সমীকরণ ও প্রাচীনতম কাল থেকেই গণিতে প্রবেশ লাভ করেছে। মিশরে, গ্রীসে এদের অজস্র উদাহরণ পাওয়া যায়। উচ্চাংগ সমীকরণের সন্ধান আর্যভটের অনেক আগেই প্রাক্-খৃষ্টযুগে ভারতীয় গণিতানুশীলনে পাওয়া যাবে। দশমিক প্রথা, প্রগতি (Series) ও সমীকরণ গণিতের এই তিন নিয়মের বিস্তৃত অনুশীলন বীজগণিত উদ্ভাবনে যথেষ্ট সহায়ক হয়েছিল। এই তিন উপকরণ যোগে বীজগণিতের জন্ম।

ভারতবর্ষ থেকে বীজগণিত সরাসরি গিয়েছে আরবদেশে। সিন্ধু থেকে ভারতীয় রাজদূত মারফৎ এক সার্থক সাংস্কৃতিক জন্ম হয়েছিল তাঁরই আনীত "ব্রহ্মস্ফুট সিদ্ধান্তের" অনুবাদ

হোল আরবী ভাষায়। আরবীয় গণিতের দিকপাল মহম্মদ বেন-মুশা-অল-খবারিশ্‌মির বীজগণিত পুস্তকের নাম ছিল ঃ "অল-জাবর—আ-অলমুকাবলাহ।" পঞ্চদশ শতাব্দীতে এই বইয়ের ল্যাটিন অনুবাদে মূল নাম প্রায় অবিকৃত থেকে গেল। অল-জাবর হোল অ্যালজেব্রা, বীজগণিতের আধুনিক ইংরাজী প্রতিশব্দ। "অল-জাবর—আ-অলমুকাবলাহ" শব্দের ইরাজি হোল ঃ "রি-ইউনিয়ন অ্যাণ্ড কম্‌প্যারিজন।" মূলত সমীকরণ-সমাধান কেন্দ্র করেই এই নামের উদ্ভব। ধনাত্মক ও ঋণাত্মক সংখ্যা ও বিভিন্ন প্রতীকের যোগে এবং সাদৃশ্য বা পার্থক্য নির্ধারণে সমীকরণ সমাধিত হয়। সমজাতীয় প্রতীকদের সংযুক্তিকরণ হোল, রি-ইউনিয়ন বা অল-জাবর। সাদৃশ্য বা পার্থক্য নির্ধারণ হোল কম্‌প্যারিজন বা মুকাবলাহ্।

এই সূত্রেই অলজাবর নামের সংগে এক মজার ইতিহাস গড়ে উঠেছিল। যেহেতু সংযুক্তিকরণ অর্থে 'অল--জাবর' বা 'অ্যালজেব্রা' ব্যবহৃত হোত, কেবলমাত্র এই অর্থেই সম্পূর্ণ ভিন্ন এক উদ্দেশ্যে এই শব্দের প্রয়োগ প্রচলিত হয়েছিল স্পেনদেশে। মধ্যযুগে স্পেনের নাপিতেরা নাকি ভাঙা হাড় জোড়া লাগাতে পারতো (এককালে আমাদের দেশেও নাড়িটেপা নাপিত ছিল)। ভাঙাহাড়ের সংযুক্তিকারীরা টক করে নতুন পাওয়া বিদেশী শব্দ নিজেদের কাজের সূত্রে গ্রহণ করে বসলো। তাঁরা স্বমতে উপাধি ধারণ করলেন "অ্যালজেব্রিস্টা" বা সংযুক্তিকারী (নাপিতেরা সবদেশেই চালাক!)।

আরবদেশের আর এক দিকপাল গণিতজ্ঞের নামোল্লেখ এখানে অনুল্লেখযোগ্য হবে না। কাব্য আর গণিত এক সংগেই চর্চা করেছিল ওমর খৈয়াম। জ্যোতির্বিদ্যা আর হিন্দু বীজগণিতে সমান দখল ছিল ওমরের। পার্শিয়ান ভাষায় তিনি লিখেছিলেন "রুবাইয়াৎ" আর আরবীভাষায় লিখেছিলেন বীজগণিত। খলিফের তিনি সভাকবি ছিলেন না আসলে ছিলেন রাজ-জ্যোতির্বিদ। ফিজেরাল্ডের অনুবাদ করার কয়েক শতাব্দী আগে ইউরোপে ওমর খৈয়াম পরিচিত ছিলেন বীজগণিতকার হিসেবেই। ফরাসীভাষায় ওমরের বীজগণিত অনূদিত হয়েছিল ষোড়শ শতাব্দীতে।

অ্যালজেব্রা যেমন প্রাচ্য থেকে রপ্তানী হয়েছিল প্রতীচ্যে তেমনি আরো দুটো মূল্যবান জিনিষও গিয়েছিল এশিয়া থেকে, কাগজ আর ছাপাখানা। কাগজ আর ছাপাখানার দৌলতে ষোড়শ শতাব্দীতে হিন্দু আরবীয় বীজগণিতের প্রসার সহজতর হোল। অন্তত তিনখানা ল্যাটিন অনুবাদ হোল একই যুগে অল-খবারিশ্‌মির।

আধুনিক বীজগণিতের বিকাশে তিনটে নাম প্রায় এক নিঃশ্বাসে উচ্চারণ করতে হয়। কার্ডান, ভিয়েতা ও দেকার্তে। ষোড়শ শতাব্দী থেকেই সুরু হল আধুনিকীকরণ। গিরোলামো কার্ডানের (১৫০১-১৫৭৬) প্রথম বই 'আর্স-ম্যাগ্‌না' প্রকাশিত হোল ১৫৪৫ খৃষ্টাব্দে। আধুনিক বীজগণিতের প্রথম গ্রন্থ বলে অভিহিত করা যায় একে। অন্তর্ভুত প্রতিভা এই কার্ডান। তিনি একাধারে চিকিৎসক, গণিতজ্ঞ, বৈজ্ঞানিক, জ্যোতিষী, প্রবন্ধক এবং জুয়াড়ী। চিকিৎসা ছিল তাঁর পেশা, নেশা হল গণিত। আসলে চিকিৎসায় তাঁর মন ছিল না। উপার্জন করতে না পেরে তাঁকে কিছুকাল সপরিবারে অনাথ আশ্রমে কাটাতে হয়েছিল। কার্ডানের প্রিয়তম বন্ধু গণিতজ্ঞ টার্টাগ্লিয়া। টার্টাগ্লিয়া ত্রিঘাত সমীকরণ(Equation of the third degree) সমাধানের এক পদ্ধতি বের করেছিলেন। অতি সযত্নে এই তথ্য তিনি গোপন রেখেছিলেন। অনেক অনুরুদ্ধ হবার পর শেষ পর্যন্ত কখনও প্রকাশ না করার শপথ করিয়ে নিয়ে তবেই টার্টাগ্লিয়া কার্ডানকে জানালেন এই গোপন তত্ত্বটি। কিন্তু ১৫৪৫ সালে টার্টাগ্লিয়া সবিস্ময়ে দেখলেন 'অর্স ম্যাগ্‌না'তে তাঁর ত্রিঘাত সমীকরণ সমাধান পদ্ধতি প্রকাশিত হয়ে গেছে। সে সময়কার প্রচলিত বীজগণিতের সমস্ত তত্ত্ব ও তথ্য কার্ডান তাঁর বইতে সংক্ষিপ্ত আকারে প্রকাশ করেছিলেন। তারপরেই কার্ডান ও টার্টাগ্লিয়ায় প্রচুর কলহ ও বন্ধুবিচ্ছেদ। গণিতজ্ঞ হিসেবে

কার্ডান খুব উল্লেখযোগ্য ঐতিহাসিক ব্যক্তি নন। আসলে তাঁর মনস্বীতা বীজগণিতের বিজ্ঞান সম্মত সার্থক সংকলনে। এতদিন পাটীগণিতের সংগে বিক্ষিপ্ত আকারে বীজগণিত তত্ত্ব ছড়িয়ে-ছিল যার ইংরাজী প্রতিশব্দ "অ্যালগরিদ্‌ম্‌" থেকে অ্যাল্‌জেব্রা।

প্রতীকবহুল বিষয়বস্তুতে বীজগণিতকে সহজ প্রকাশ রূপ দিলেন ফরাসী গণিতজ্ঞ ভিয়েতা (১৫৪০)। বর্ণমালার ব্যঞ্জনবর্ণের প্রতীক সাজিয়ে তিনি অজ্ঞাত সংখ্যাদের রূপ দিলেন আর বিভিন্নজ্ঞাত সংখ্যার প্রতীক সাজালেন স্বরবর্ণ দিয়ে। বীজগণিতে এই ধরণের সহজতর প্রতীক প্রয়োগ তার বিকাশের পথ সরলকরে তুললো। গণিতরাজ্যে এ একমাত্র তুলনা করা চলে পাটীগণিতে দশমিক প্রণালী প্রবর্তনার সংগে। বীজগণিতের এই বৈপ্লবিক পরিবর্তনের রূপটি যদিও এখনও অনুসৃত হয় না তবু তার নীতিগত প্রয়োগ ও ব্যবহার পদ্ধতি আধুনিক বীজ-গণিতের অপরিহার্য অনুষংগ।

এই পন্থা অনুসরণ করেই পরিবর্তন এনেছিলেন দেকার্তে (১৫৯৬-১৬৫০)। ১৫৯০ সালে যখন দেকার্তের "জ্যামিতি" প্রকাশিত হোল তখন দেখা গেল যে বর্ণমালার প্রথম অক্ষর-গুলি (যথা : এ. বি. সি .....) তিনি সাজিয়েছেন জ্ঞাত সংখ্যাদের প্রতীক বা অংকপাত (নোটেশন) রূপে। আর শেষ অক্ষরগুলি (যথা : এক্স, ওয়াই, জেড্) সাজিয়েছেন অজ্ঞাত সংখ্যাদের প্রতীক রূপে। বীজগণিতীয় অংকের আধুনিক প্রকাশরূপ দেকার্তের অনুসরণেই।

বীজগণিতে প্রতীক বা অংকপাতনের প্রয়োগ-কৌশল এক বৈপ্লবিক চেতনার জন্মদাতা। ফলশ্রুতি স্বরূপ, নিউটন, অয়লার, হর্ণার, জটিলতর প্রতীক নিয়মে বীজগণিতের কঠিনতর সমীকরণ ও অন্যান্য অংক সমাধানের সূত্র আবিষ্কার করেছেন। বিজ্ঞানের তত্ত্ব প্রকাশে অন্যতম ভাষার সন্ধান দিয়েছেন বীজগণিতীয় প্রকাশ মাধ্যমে।

প্রাক্-ভিয়েতাযুগে বীজগণিতের বিকাশ মোটামুটিভাবে পাটীগণিতের সংগেই যুক্তছিল। বিষয়-গত ও গুণগত পার্থক্য থাকলেও বীজগণিতের প্রকাশ-কৌশল পাটীগণিতীয় প্রকাশমাধ্যমে যথেষ্ট সম্পর্কিত ছিল। স্বতন্ত্র শাস্ত্র হিসেবে গড়ে ওঠায় তার প্রসংগত বাধা না থাকলেও আংগিক-গত স্বাতন্ত্র্য ছিল না ও মৌলিক প্রকাশ ভংগিমাও ছিল না। সরল প্রতীকের প্রয়োগে বীজ-গণিতের মুক্তিস্নান। তাই উত্তর-ভিয়েতা যুগে বীজগণিতের অগ্রগতি অসম্ভব দ্রুতগতিতে।

ভিয়েতা তাঁর পুস্তকের নাম দিয়েছিলেন "বিশ্লেষণ শাস্ত্রের ভূমিকা" (An Intdo-duction to the Art of Analysis) প্রতীক প্রয়োগে বীজগণিতের সহজ-সাধ্য হয়েছে তার বিশ্লেষণ ক্রিয়া। হিন্দু গণিতজ্ঞেরা এরই প্রতিশব্দ করেছিলেন "বীজ"। অন্তত হাজার বছর আগে বীজগণিত ও পাটীগণিতের পার্থক্য নির্ণয়ে ভারতীয় গণিতজ্ঞেরা বীজগণিতীয় বিশ্লে-ষণের গুরুত্ব কোথায় তা ধরতে পেরেছিলেন। গণিতে সরস প্রতীক-সন্ধানে তাঁরা যথেষ্ট পরিশ্রম করেছিলেন। তাই বিশ্লেষণ বা বীজের প্রাধান্য রেখেই এই বিশিষ্ট গণিতের নামকরণ তাঁরা করেছিলেন বীজগণিত।

রবীন্দ্রনাথ ও পত্রপুট

সাধনা সরকার

রবীন্দ্রনাথের গদ্যকাব্যের প্রণোদনা সূচিত হয় প্রধানত তাঁর গদ্যরচনার ক্ষেত্রে। যখনই তিনি কোন ব্যক্তিগত রচনায় মনোনিবেশ করেছেন, গদ্যকবিতা রচনার সম্ভাবনা সেই সময়েই দেখা দিয়াছে।

রবীন্দ্রনাথের কৈশোরকালে লিখিত 'পুষ্পাঞ্জলি'র অন্তর্গত কয়েকটি সুললিত গদ্যখণ্ড পরবর্তীকালে 'লিপিকায়' রূপান্তরিত হয়। এইসব রচনায় গদ্যকবিতার কোন আভাস পাওয়া যায় না বটে, কিন্তু এগুলির পরিমিত পরিবেশন ও সংবৃত ভাবসৌকর্য কোনক্রমেই অনস্বীকার্য নয়। 'লিপিকা'র ভূমিকায় কবি স্পষ্ট বলেছেন যে,—গদ্যকাব্যের একটি বিশেষ ছন্দ ও পর্ব থাকবে। কারণ গদ্যকাব্য আঙ্গিককে অস্বীকার করে। সর্বতন্ত্রীন মুক্তির দাবীতে কোনদিনই প্রতিষ্ঠিত হবার নয়।

রবীন্দ্রনাথের ব্যক্তিগত রচনায় (জীবনস্মৃতি, ছিন্নপত্র, পথে ও পথের প্রান্তে, জাভাযাত্রীর পত্র। য়ুরোপযাত্রীর ডায়ারি প্রভৃতি) গদ্যকাব্যের অস্ফুট আভাস সূচিত হতে দেখা যায়। এই সব লেখায় কবির গহন মনের গভীর সত্তাকে কেন্দ্র করে যে বিচিত্র ভাবার্পিত সংবেদনশীলতা প্রকাশিত, তা উত্তরকালের কবি-সৃষ্ট গদ্যকবিতার মতই ছন্দ-সুষমাবন্ধ।

'লিপিকা'র ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথের গীতিধর্মী ভাব-সত্তা প্রাধান্য লাভ করেছে। একদিক থেকে গদ্যকাব্যের বীজ নিহিত ছিল তাঁর 'বলাকা' কাব্যে। পয়ার ছন্দের ক্লান্তিকর পুনরা-বৃত্তির বেড়া ভেঙে কবি তাঁর 'বলাকা' কাব্যে যে নূতন অমিত্রাক্ষর ছন্দ বা মুক্তক ছন্দের সূচনা করলেন, যেখানে অন্ত্যানুপ্রাস না থাকলেও আন্তরানুপ্রাস ছিল। তবু পয়ারের গতানুগতিকতা অপসারিত করে রবীন্দ্রনাথ বিদেশী ছন্দের অনুসরণে এই যে নবতর ছন্দের সৃষ্টি করলেন, তার মুক্ত প্রবাহে ও সাবলীল স্পন্দনশীলতায় কাব্যের প্রকাশ অধিকতর মাধুর্যময় ও প্রতীকধর্মী হয়ে উঠলো। তাই 'বলাকা'য় একাধারে গদ্যের প্রাঞ্জলতা ও চিন্তাশীলতা এবং কবিতার মাধুর্য ও আবেগ বর্তমান।

রবীন্দ্রনাথের শেষ দশ বৎসরে তাঁর কবি-জীবনের পরম উত্তরণ ঘটে। 'পূরবী' থেকে 'শেষ লেখা'য় তারই শিল্পায়ত স্বাক্ষর। 'পুনশ্চ', শেষ সপ্তক, পত্র পুট, জন্মদিনে প্রভৃতি কবি-জীবনের গোধূলি-অধ্যায়ের কাব্য। এই কাব্যসমূহে কবি-মানসের একটি বিমিশ্র দ্যুগ্‌ভঙ্গী প্রকাশিত। আধুনিক কবিতার আত্যন্তিক বিষয়-নিষ্ঠা বা বস্তু-এষণা রবীন্দ্রনাথের হৃদয়স্পর্শ করতে পারেনি। তিনি কাব্যান্তর্গত শিল্পীজনোচিত নিরাসক্তি নৈর্ব্যক্তিক ভাব-চেতনা এবং ভারসাম্যের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হলেও আধুনিক কাব্যের তীক্ষ্ণাগ্র বস্তুবিন্যাসকে কোনদিনই মনে-প্রাণে গ্রহণ করতে পারেননি। নির্মিতির দিক থেকে 'পরিশেষ' কাব্যের সংগে 'পত্র পুটের' কিছু সাদৃশ্য লক্ষ্য করা যায়।

পূর্ববর্তী কাব্যসমূহে গদ্যকবিতার বীজরোপণ ও অঙ্কুরোদ্‌গম এবং 'পত্র পুটে' তার বিচিত্র পুষ্পায়ন। এলিয়ট্-ডান্-সঞ্চারী কবি-মানস সে সময়ে একটি ব্যাপ্ত আধুনিক মনোভাব পোষণ করছে। আর এই মনোভাবের ভিত্তিভূমি ঐকান্তিক বস্তুনিষ্ঠা। তাই পত্রপুট কাব্য হয়ে উঠেছে একান্ত দূরযানী ভাবনার বলিষ্ঠ প্রতীক—রাবীন্দ্রিক কাব্যপ্রবাহে ঋতুবদলের নবীন

পালা। গদ্যের স্বল্পায়তনী বিন্যাস ও কবিতার সুদূরধর্মী ব্যঞ্জনা, কথার পরিমিতি-বোধ এবং এবং সুরের মূর্চ্ছনা 'পত্রপুট' কাব্যতন্ত্রীকে উচ্চগ্রামে বেঁধে রেখেছে।

এ সম্পর্কে কবি-কৃত 'পুনশ্চে'র ভূমিকালিপির কিয়দংশ স্মরণীয় : "গদ্য কাব্যে অতি-নিরূপিত ছন্দের বন্ধন ভাঙাই যথেষ্ট নয়। গদ্যকাব্যের ভাষায় ও প্রকাশরীতিতে যে একটি অতি সসজ্জ ও সলজ্জ অবগুণ্ঠনপ্রথা আছে, তাও দূর করলে তবেই গদ্যের স্বাধীন ক্ষেত্রে তার সঞ্চরণ স্বাভাবিক হতে পারে।"

রবীন্দ্রনাথের গদ্যকবিতা তাঁর বিচিত্র সৃজনী-প্রতিভার অভিনব ফলশ্রুতি। কবির গদ্য-রচনার ক্ষেত্রে যেমন পর্ববিভাগের দোলা, তাঁর গদ্যকবিতায়ও অনুরূপ ছন্দোময়তা বিরাজমান। মিতাচারী ভাবনার সংহত বিন্যাসে, বিচিত্র পংক্তি-স্থাপনায় ও স্তবকবৈচিত্র্যে 'পত্রপুট' সার্থক। গদ্যকবিতা হয়েও কবিতার ছন্দ বজায় রেখে গদ্যের কঠিন মৃত্তিকায় স্বচ্ছন্দ পদচারণার এ এক স্বয়ম্ভু পরিচিতি। পার্থিব জীবনের কঠিন বাস্তব-চেতনাকে রবীন্দ্র-মানসের সুস্থিত দার্শনিক ভাবনায় মিলিয়ে নেওয়ার দুরূহ প্রয়াসে 'পত্রপুট' আশ্চর্যভাবে রসোত্তীর্ণ। এখানে কবি একা-ধারে যুক্তিবাদী ও সুদূরায়তনকল্পনাচারীর ভূমিকায় আবির্ভূত। গীতিধর্মিতাকে গদ্যের পাশে রেখে, চূড়ান্ত বাস্তবের মাঝে চূড়ান্ত কল্পনাকে স্থাপন করে রবীন্দ্রনাথ যে তাঁর মানবিকতা-সমৃদ্ধ আধুনিক মনোভাবের পরিচয় দিয়েছেন—তার দিকে চেয়ে এই কথাই বলতে পারা যায় যে জীবনের সান্ধ্য-মুহূর্তেও তিনি প্রজ্ঞাতিক চেতনার নিতানব আবাহনে অক্লান্ত শিল্পী। তাই গোধূলি অধ্যায়ের কাব্য মধ্যাহ্ন-সূর্যের তীব্র ঔজ্জ্বল্যে হয়ে উঠেছে বাস্তবের কুণ্ঠাহীন স্বাক্ষর।

কবির বিষয়-চেতনা এখানে বিচিত্র বস্তুকে আশ্রয় করেছে। অতি সাধারণ তুচ্ছ বিষয়-বস্তুর অন্তরালে প্রসুপ্ত যে রসচেতনা, বাস্তবের কঠিনতা-বন্ধ পৃথিবীতে অন্তঃশীলার মত প্রবহমান যে রোম্যান্টিক ভাবকল্পনা, গদ্যাশ্রয়ী তথাময়তাকে ঘিরে জেগে উঠেছে যে কাব্যিক অনুপ্রাণনা এবং দার্শনিক তত্ত্বময়তার সঙ্গে গীতিধর্মী ভাবনার যে আশ্চর্য সমাবেশ লক্ষ্য করা গেছে—এই প্রগতিপন্থী, অগ্রচারী দৃষ্টিভঙ্গীর জন্যই 'পত্রপুট' কাব্যে সমকালীন আধুনিক কাব্য-সাহিত্যে সুদূর প্রভাব বিস্তার করেছে।

'পত্রপুটে'র কয়েকটি কবিতা বিশ্লেষণ করলে কবির এই সূক্ষ্মতীক্ষ্ম বাস্তব-চেতনার পরি-চয় পাওয়া যাবে। পত্রপুটের প্রথম কবিতার একটি অংশ :

'ছিলাম দার্জিলিঙে,
সদর রাস্তার নিচে এক প্রচ্ছন্ন বাসায়।
সন্ধ্যাদের উৎসাহ হল
রাত কাটাবে সিঙ্গল পাহাড়ে।
সঙ্গে ছিল একখানা এসরাজ, ছিল ভোজের পোটিকা
ছিল হো হা করবার অদম্য উৎসাহী যুবক
টাট্টুর উপর চেপেছিল আনাড়ি নবগোপাল
তাকে বিপদে ফেলবার জন্য ছিল ছেলেবের কৌতুক।

কবির এই একান্ত বস্তু-নিষ্ঠা আধুনিক কবিদের শরীরী বস্তুনিষ্ঠার অনেকটা সমধর্মী বলেই মনে হয়। ঐ কবিতারই আর এক স্থানে—

'এমন সময় পিছন ফিরে দেখি
সামনে পূর্ণচন্দ্র
বন্ধুর সাক্ষাৎ হাস্যদ্যুতির মতো।'

গদ্যকাব্যের মুখরতা ও আলাপচারিতার উজ্জ্বল রসাবেশে অংশটি অপূর্ব। এই পরিবেশ-তারলোর সমধর্মী নিদর্শন মেলে নির্জন কবি জীবনানন্দের 'অবসরের গানে' এক অংশে—

'চারিদিকে এখন সকাল
রোজের নরম রং শিশুর গালের মত লাল।

ইংরাজ কবি টি. এস. এলিয়টের রচনাতেও এমনি আলাপ-চারিতার সুর লক্ষ্য করা যায়। 'The Love Song of J. Alfred Plufrock' কবিতার একটি অংশ :

When the evening is spread at against the sky
Like a patient etherised upon a table

অথবা, ঐ কবিতারই আর এক স্থানে :

'Have known the evenings, mornings, afternoons.
I have measured out my life with coffee spoons.'

জীবনানন্দ ও এলিয়টের কবিতার চিত্রকল্পের সংস্থান লক্ষণীয়—রবীন্দ্রনাথের 'পত্রপুটে' কাব্যের চিত্রকল্প-ও পরিচিত বস্তু-সমৃদ্ধ হওয়ায় আশ্চর্যভাবে মানবিক-চেতনাশ্রিত হয়ে উঠেছে।

দ্বিতীয় কবিতার প্রথমাংশে :—

'আমার ছুটি চারদিকে ধূ ধূ করছে
ধান-কেটে-নেওয়া খেতের মতো।'

চিত্রকল্পের অদ্ভুত ধূসরিমা জীবনানন্দের ধূসরতার কথা স্মরণ করায়। আমেরিকার আধুনিক কবি রিচার্ড এবরহার্টের একটি কবিতার অংশে অনুরূপ ম্লানায়মান অথচ দৃঢ়-নিবদ্ধ ধূসর ভাবনার প্রকাশ লক্ষ্য করা যায় : My eyes,
Telescoped on delay, I out of command.'

দৈনন্দিন জীবনের ব্যবহৃত তদ্ভব শব্দগুলির শিল্পায়ত বিস্তৃতি লক্ষ্য করা যায় পত্রপুটের কবিতাগুলিতে। দ্বিতীয় কবিতার একটি অংশ :

'দেখলেম বর্ষা গেল চলে সংশয়িত উত্তরে হাওয়ার।'
* * * * *
কালো ফরাশটা নিল গুটিয়ে।
ভাদ্রশেষের নিরেট গুমটের উপরে পূজার পার্বণে চাঁদের নূতন উত্তরী
থেকে থেকে ধাক্কা লাগল বর্ষাজলে ধোপ দেওয়া।'

ছত্রটির রহস্য-বিধূরতা জীবনানন্দের 'শব' কবিতার অমূর্ত ভাবচেতনার রহস্যময়তার সঙ্গে তুলনীয় :

* * * * *
'নক্ষত্রের রাতের আঁধারে
বিরাট নীলাভ খোঁপা নিয়ে যেন নারী মাথা নাড়ে 'আজ নি-খরচার হাওয়া-বদল জলে স্থলে।'
পৃথিবীর অন্য নদী।' 'পাতায় পাতায় যেন বাহবা-ধ্বনি উঠেছে।'

এইসব অকুলীন শব্দের এমন অসঙ্কোচ প্রয়োগ কবির পূর্বেকার কোন কাব্যে দেখা যায়নি—বাস্তব-চেতনার এমন নিবিড় অনুভূতিও প্রকাশিত হয়নি তাঁর পূর্বলিখিত কাব্য-গ্রন্থগুলিতে।

বস্তুতঃ, তদ্ভব শব্দের বিপুল অর্থব্যাপ্তি ঘটিয়ে রবীন্দ্রনাথ তাঁর কাব্যে যে বাস্তবরসের সঞ্চার করেছেন, তা আধুনিক কবিতারই সমগোত্রীয় বলা চলে।

উপমা-ব্যবহারেও কবির আশ্চর্য সংস্কার-মুক্তির পরিচয় পাওয়া যায়। চতুর্থ কবিতার এক স্থানে :

'বিকালবেলার রৌদ্রকে যেমন উজাড় করে দিনান্ত
শেষ গোধূলির ধূসরতায়
তেমনি সোনার ফসল চলে গেল
অন্ধকারের অবরোধে।'

এমন বস্তু-গর্ভ উপমা-প্রয়োগের সার্থক নিদর্শন মেলে জীবনানন্দের 'অবসরের গানে'র একটি অংশে :

'তখন শস্যের গন্ধ ফুরায়ে গিয়েছে ক্ষেতে
রোদ গেছে পড়ে
এসেছে বিকালবেলা তার শান্ত শাদা পথ ধরে।'

ঐ কবিতার আর একটি অংশে : 'প্রান্তরে আপন ছায়ায় মগ্ন একলা অশ্বত্থ গাছ
সূর্য-মন্ত্র-জপকরা ঋষির মতো।'

কাব্যাংশদ্বয়ের চিত্রকল্পজনিত সৌন্দর্য ও বস্তু-গর্ভ নিগূঢ় ব্যঞ্জনা আধুনিক কবি-মানসের বিস্তৃত-ক্ষেত্রে সুদূরবিহারী প্রভাব বিস্তার করে।

অতি-বাস্তবতাসম্মত কাব্যায়ন—যা আধুনিক কবিতার একটি অবিচ্ছেদ্য উপাদানরূপে তার চিত্রকল্প শরীরী সৌন্দর্যকে গড়ে তুলতে সাহায্য করে, তার আশ্চর্য প্রকাশ নিচের কবিতাংশগুলিতে। পঞ্চম কবিতার এক অংশ :

'নির্বিশেষে ছড়িয়ে পড়ল আলো মাঠে বাটে
মহাজনের টিনের ছাদে,
শাকসবজির ঝুড়িচুপড়িতে,
আঁটিবাঁধা খড়ে,
হাঁড়িমালসার স্তূপে,
নতুন গুড়ের কলসীর গায়ে।'

* * * * *

'এসে পড়ল পাটকিল রঙের অন্ধকার,
শুকনো ধুলোর দম-আটকানো তুফান।
ছুঁড়ে মারে টুকরো ডাল শুকনো পাতা,
চোখে মুখে ছিটোতে থাকে কাঁকরগুলো;
আকাশটা ভূতে—পাওয়া।'

'তীক্ষ্ণ হাওয়া সাঁই সাঁই শান দিচ্ছে আর চালাচ্ছে ছুরি
অন্ধকারের পাঁজরের ভিতর দিয়ে।
জলে স্থলে শূন্যে উঠেছে
ঘুরপাক-খাওয়া আতঙ্ক।'

অবশেষে এই ঝোড়ো পরিবেশের সমাপ্তি নেমেছে জীবনানন্দ-সুলভ স্বপ্নে-গাঁথা কথার মালায় :

'কালি হয়ে এল অন্ধকার নিকষ-পাথরের মতো;
কেবলি চলল ব্যাঙের ডাক,
ঝিঁঝি পোকার শব্দ,
জোনাকির মিটি মিটি আলো,
আর যেন স্বপ্নে আঁতকে-উঠা দমকা হাওয়ায়
থেকে থেকে জলঝরা ঝাউয়ের ঝরঝরাণি।' (নবম কবিতা)

একটি আশ্চর্য ব্যঞ্জনাময় শিল্প-সত্তা বহন করছে নিচের ছত্রটি :

'ফুলগুলি যেন আলো পান করবার
শিল্প করা পেয়ালা, বেগুনি রঙের।'

জীবনানন্দের বহু-পরিচিত কবিতার একটি অংশ মনে পড়ে যায় :

'চুলে তার কবেকার অন্ধকার বিদিশার নিশা
মুখ তার শ্রাবস্তীর কারুকার্য।'

আবার এমন ছত্রও আছে, যেখানে কবি চূড়ান্ত সুন্দরের পাশে চরম কর্কশকে স্থাপন করে গদ্য-কাব্যের বৈশিষ্ট্যকেই নতুন পরিচ্ছদে অলংকৃত করেছেন।

'অস্তগামী সূর্য শ্যামল শস্যহিল্লোলে রেখে যায় এই অকম্পিত বাণী
'আমি আনন্দিত'।

অন্যদিকে তোমার জলহীন, ফলহীন, আতঙ্কপাণ্ডুর মরুক্ষেত্রে
পরিকীর্ণ পশুকঙ্কালের মধ্যে মরীচিকার প্রেতনৃত্য।'

আধুনিক কবিতার পরিস্রুত ও প্রতীকসর্বস্ব পরিকল্পনাই তৃতীয় কবিতায় রূপলাভ করেছে বলা যায়। পৃথিবী অর্থাৎ মর্তকেন্দ্রিক জীবনের প্রতি গভীর অনুরাগ, যা বর্তমান শতকের প্রত্যেক স্রষ্টা-মনকে আলোড়িত করছে, সেই অসাধারণ চিত্ত-সংস্কারের বাণী-বহন করেছেন রবীন্দ্রনাথ 'পত্রপুটের' মাধ্যমে। ব্যক্তিগত ও নৈর্ব্যক্তিক সত্যানুসন্ধানে জাগ্রত কবি-মানস উত্তরণ লাভ করেছে 'পত্রপুটে'র বিস্তৃত পার্থিব চেতনায়—তাই মানুষের কবি আপন অন্তরের বাণীটিকে শতদলের মত খুলে ধরেছেন পৃথিবীর সম্মুখে।

'আমি বাস করি
তোমার ভাঙা ঐশ্বর্যের ছড়ানো টুকরোর মধ্যে।
আমি খুঁজে বেড়াই মাটির তলায় অন্ধকার...' (এগারো নং কবিতা)

* * * * *

কবি আমি ওদের দলে,—
আমি ব্রাত্য, আমি মন্ত্রহীন,
দেবতার বন্দীশালায়
আমার নৈবেদ্য পৌঁছল না।

সকল মন্দিরের বাহিরে
আমার পূজা আজ সমাপ্ত হল
দেবলোক থেকে
মানবলোকে,
আকাশে জ্যোতির্ময় পুরুষে,
আর মনের মানুষে আমার অন্তরতম আনন্দে।'

* * * * *

(পনেরো নং কবিতা)

কবির সংস্কার-মুক্তির বাস্তবায়ত স্বাক্ষর এইসব ছত্রেই নিহিত। খুঁজে নিতে হয় না, তারা আপনিই ধরা দেয়। এ মন্ত্রহীনতা, ব্রাত্য জীবনের এ আশীর্বাদ কবিতার ও স্রষ্টারই মন্ত্রহীনতা ও আশীর্বাদ। কারণ, কাব্যের দেউলে গদ্যের প্রবেশাধিকারের সগৌরব বাণী বহন করেছে 'পত্রপুট'। কঠিনের মধ্য দিয়ে সুন্দরের সান্নিধ্য আশা করেন কবি, কর্কশের মধ্যে দিয়ে পেতে চান ললিতকে—এই বস্তুনিষ্ঠ, মানবিক প্রবণতাই (attitude) কোমল গীতিধর্মী ভাব-সমৃদ্ধ হয়ে মুক্তিলাভ করেছে উদ্ধৃত কবিতাদ্বয়ে। ষোড়শ সংখ্যক কবিতা সভ্যতার প্রদোষকালের প্রতি কবির 'সিনিক' মনোভাবের অন্তর্জ্বালায় পূর্ণ। তাই যুগান্তরের অনাগত কবির প্রতি 'পত্রপুটে'র কবির আহ্বান :

'দাঁড়াও ওই মানহারা মানবীর দ্বারে, হিংস্র প্রলাপের মধ্যে
বলো, ক্ষমা করো,— সেই হোক তোমার সভ্যতার শেষ পুণ্যবাণী।

সপ্তদশ সংখ্যক কবিতায় রণোন্মাদনার বিপুল হুংকারধ্বনির মধ্যে এই চেতনা প্রাধান্য লাভ করেছে। নৈরাশ্যজনিত বিষণ্ণতার অন্তরালে একটি আশাদীপ্ত প্রাণের ক্ষমাসুন্দর প্রশান্তির সুরটি সহজেই দৃষ্টি আকর্ষণ করে : চলেছে ওরা দয়াময় বুদ্ধের মন্দিরে
নিতে তাঁর প্রসন্ন মুখের আশীর্বাদ।'

অষ্টাদশ সংখ্যক কবিতায় কবি-মানসের মধ্যে কথিত বাণীর ধারাকে সংহত করার প্রয়াস লক্ষ্য করা যায়।

'পত্রপুটে'র তাঁর মানবিক চেতনা ও কবি-মানসের ওজস্বিতা লক্ষণীয়। এ কাব্য দিবা-বসানের কাব্য—সভ্যতা-সন্ধিক্ষণের কাব্য। কোন কোন কবিতায় ব্যক্তিগত ভাববসের কোমল সৌন্দর্যের প্রকাশ দেখা যায়। কিন্তু ব্যক্তিগত চেতনার সীমিত গণ্ডী থেকে নৈর্ব্যক্তিক ভাবনার সীমাহীন শূন্যলোকে মুক্তির আভাস-ও পেয়েছি। সৌন্দর্য ও রোমান্টিক এষণার দিকটি যেমন সত্য হয়ে উঠেছে, অনুরূপভাবে সত্য হয়েছে সৌন্দর্য-বুদ্ধির, বাস্তবতর ও বিস্তৃততর ভূমিকা। বাউলের মতই কবি তাঁর উদ্ভূপা ভাবনার সুমেরুশিখর থেকে অবতরণ করেছেন লোকায়ত জীবনের সমতলভূমিতে। ধ্রুপদী চেতনার প্রাচীনতর অভিজাত-সংস্কৃতিকে লোক-জীবন-স্বাভাবিত স্থূল ভাবনায় মিশ্রিত করেছেন তাই কাব্যের শব্দ ব্যবহারে তাঁর সংস্কারমুক্ত স্বচ্ছ মনের পরিচয় মেলে।

তৎসম শব্দের পাশে তদ্ভব শব্দ ব্যবহার করে কাব্যগত বস্তু-নিষ্ঠা বিস্তৃততর করে তুলে-ছেন। পত্রপুটের অধিকাংশ কবিতায় অভিজাত শব্দের পাশাপাশি অকুলীন শব্দসমূহের সার্থক সন্নিবেশ লক্ষ্য করা যায়, যার ফলে কাব্যের সামগ্রিক আবেদন গভীরতর হয়ে উঠেছে।

প্রকৃতপক্ষে রবীন্দ্রনাথের দৃগ্‌ভঙ্গী এস্থলে আশ্চর্য সংস্কারমুক্তি ও ঔদার্যের প্রসন্নতায় একান্ত দূরযাত্রী হয়ে উঠেছে। পরস্পর-বিরোধী ভাবসমূহের শুভ মিলনে 'পত্রপুটে'র কবির নিবিড় আকাঙ্ক্ষাটাই সার্থকতার শিখরে বিলীন।

কাব্যটির নামকরণের সার্থকতা বহন করছে ত্রয়োত্রিংশ সংখ্যক কবিতা।

'বিশ্বভুবনের সমস্ত ঐশ্বর্যের সঙ্গে আমার যোগ হয়েছে
মনোবৃক্ষের এই ছড়িয়ে পড়া
রসলোলুপ পাতাগুলির সংবেদনে।'

এই পত্রগুচ্ছেরই সম্মিলিত স্তবক 'পত্রপুট'। অস্তমান কবি-মানসের বিচিত্র ভাবনার অনবদ্য পরিণতি। বিষম-মাত্রিক যতিনির্ধারণের অনায়াস প্রচেষ্টায়, অসম ছন্দস্পন্দের মৃদু-মন্দর প্রবহমানতায় এবং গদ্যোচিত বাচনভঙ্গির বাস্তবায়ত আবেদনে এ কাব্য সমগ্র রবীন্দ্র-কাব্য সাহিত্যপ্রবাহে স্বয়ং-স্বতন্ত্র মহিমায় অনন্য হয়ে আছে। শুধু তাই নয়, এর মর্মসূত্রে বিধৃত যে সুররিয়ালিস্ট ভাবনার রোমান্টিক স্বতঃস্ফূর্ততা, যে তীক্ষ্ণাগ্র বাস্তবতার শরীরী স্পর্শ-কাতরতা, সেই ঐতিহ্য-সম্ভব চৈতন্য-চেতনাই আধুনিক বাংলা কবিতার সহস্রমুখী উৎসারণের পথ খুলে দিয়েছে বলে মনে করি। এদিক থেকে রবীন্দ্রনাথ আধুনিক কবিতার একজন সার্থক পথিকৃৎ ও স্থপতিকার।

জাতীয় নাট্যশালা প্রসঙ্গে

রাখাল ভট্টাচার্য

শিশিরকুমারের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে জাতীয় নাট্যশালা প্রসঙ্গে কিছু কিছু উৎসাহের প্রকাশ দেখা যাচ্ছে এবং সেই প্রসঙ্গে উদ্দেশ্যমূলক প্রোপাগাণ্ডাও সুরু হয়ে গেছে। ভারত সরকার যখন প্রতি বড় সহরে কটি করে রঙ্গমঞ্চ তৈরী করে দেবেন বলে ঘোষণা শোনা গেছে, তখন সেই রঙ্গ-মঞ্চের অধ্যক্ষতার জন্য হাতবাড়ানোর পিছনেও সেই প্রোপাগাণ্ডা অপ্রত্যক্ষ ভাবে কাজ করছে, এমন মনে করা অশোভন বা অসঙ্গত নয়।

ইতিমধ্যে বহুল প্রচারিত কোন দৈনিক পত্রিকায় পত্রযোগে দাবী করা হয়েছে, শ্রীযুক্ত শম্ভু মিত্র, শ্রীযুক্ত উৎপল দত্ত, শ্রীযুক্ত তরুণ রায় এবং শ্রীযুক্ত সত্যজিৎ রায়কে নিয়ে কমিটি করে সেই কমিটিকে জাতীয় রঙ্গশালা প্রতিষ্ঠার দায়িত্ব দেওয়া হোক।

যে যুগে ইট কাঠ পাথর রঙ পর্দা গদী চেয়ার কার্পেট সমাবেশে রঙ্গমঞ্চগৃহ নির্মাণকে সরকারী মহল জাতীয় রঙ্গশালা প্রতিষ্ঠা বলে দাবী করে সে যুগে মঞ্চব্যক্ষ যে কেউ হতে পারেন এবং তাঁর হাতে ক্ষমতা থাকলে তাঁকেই আমরা জাতীয় নাট্য আন্দোলনের পুরোধা বলে হাত কচ্‌লাবো।

কিন্তু নাট্যশালা রঙ্গমঞ্চগৃহের চেয়ে আরও অনেক কিছু এই বোধটা জাগলে জাতীয় নাট্যশালা প্রতিষ্ঠা প্রয়াসে আমরা প্রথমেই জাতীয় নাট্যশালার স্বরূপ নির্ধারণ করতাম।

নতুনত্বের প্রয়োজন আছে গুরুত্ব আছে, কিন্তু তার নতুনত্বে মুগ্ধ হয়ে অতীতকে অস্বী-কার করাটা যৌবনচাপলোর অপরিহার্য অঙ্গ হলেও, জাতীয় জীবনগঠনে তা ক্ষতিকর প্রভাব। মহীরুহ আকাশে শাখা প্রশাখা বিস্তার করে, মাথা তোলে ঊর্ধ্ব থেকে ঊর্ধ্বতর লোকে; কিন্তু রস সংগ্রহ করে মাটির গভীরে শিকড় প্রসারিত করে দিয়ে। জাতীয় জীবনের বিকাশেও সেই একই নিয়ম। জাতীয় ঐতিহ্যের গভীর স্তরে প্রেরণা ও রস সংগ্রহ করে বিশ্বের বিস্তৃত অঙ্গন থেকে নিতে হবে আলো হাওয়া, স্বাস্থ্য ও পুষ্টি।

বাঙলার তথাকথিত বিদগ্ধ সমাজে নাটক ও নাট্যশালা নিয়ে যে উন্নাসিকতা চলেছে তার সীমা পরিসীমা নেই। প্রথম চৌধুরীর বাড়ীতে শুনেছি পাব্‌লিক থিয়েটারে যাওয়া নিষিদ্ধ ছিল। আজকের দিনেও দেখতে পাই নাটক ও নাট্যশালার আলোচনা প্রসঙ্গ বেলগাছিয়া ও পাথুরেঘাটা থেকে জোড়াসাঁকোয় এসে শেষ হয়ে যায়। গিরিশ ঘোষ থেকে সুরু করে বর্তমান যুগ পর্যন্ত এই প্রায় শতাব্দী কাল ধরে ভারতের একমাত্র রঙ্গশালা নগরীতে যে অবিচ্ছিন্ন ভাবে পেশাদার থিয়েটার চলেছে, এটা যদি মূর্খ ও বেরসিক প্রাকৃতজন ভোলানো বজরুকি হয়ে থাকে, তবু শুধু দীর্ঘজীবনের দাবীতেই আলোচ্য হবার দাবী রাখে।

বাঙলা ভাষায় নাটক নেই, এই উক্তি হামেশা শুনি। অথচ গিরিশ ঘোষ থেকে আজপর্যন্ত অভিনয়ে ছেদ পড়েনি। সে অভিনয় জনপ্রিয় হয়েছে, সাধারণ মানুষের সঙ্গে বহু বিদগ্ধ জনকে আকর্ষণ করেছে। দর্শকদের মনের নিরুদ্ধভাব টেনে বার করেছে, সমাজ জীবনে অনেক তোলা-পাড়া করেছে, বিদেশী রাজশক্তির সন্ত্রাস সৃষ্টি করেছে। নাটক যদি না লেখা হয়ে থাকে তবে এতদিন কি অভিনয় হল, এটাই প্রশ্ন।

ইদানীং কে, এম, মুন্সী বেশ একটা মজার কথা বলেছেন। যদিও তাঁর রাজনৈতিক মতবাদ আমার কোনদিনই ভালো লাগেনি, তাঁর এই উক্তিটি প্রণিধান যোগ্য। তিনি বলেছেন, বর্তমান

ভারত সরকারের কাছে জাতীয় ঐতিহ্যের কোন দাম নেই। যে সমাজে শিক্ষণ প্রতিষ্ঠানে লিপষ্টিক মাখা শেখানো-ই একমাত্র শিক্ষা, সেই সব প্রতিষ্ঠানে সরকারী পৃষ্ঠপোষকতা স্বতঃস্ফূর্ত।

আমাদের সংস্কৃতিমহলেও সেই একই মনোভাব। সতীদাহ নিবারণের অজস্র যুক্তি থাকা সত্বেও আমার বিশ্বাস সহমরণ নিবারণ আন্দোলনের মূল প্রেরণা সেই সব যুক্তি থেকে আসেনি, এসেছিল সহমরণ ইয়োরোপীয় সমাজপ্রথা বিরোধী বলে। আজও আমরা নাটকের সংজ্ঞা ধরি গ্রীকনাটকের ইয়োরোপীয় সংস্করণের ঐতিহ্য অনুসারে। যেহেতু আমাদের নাটকে সংঘাতের চেয়ে ভাব বেশী, বাইরের কৃত্য থেকে অন্তরের আলোড়ন বেশী, নাটকীয়তা থেকে কাব্যরস বেশী, তাই আমাদের নাটক নাটক নয়। অনুরূপ দৃষ্টিভঙ্গী নিয়েই একথা আজ বলতে শুনেছি, যেহেতু বঙ্কিমচন্দ্রের চন্দ্রশেখর, রাজসিংহ, কপালকুন্ডলা মাত্র দু-তিনশ পাতার বই, তাই সেগুলো উপন্যাস নয়। অর্থাৎ জেমস জয়েস-এর ইউলিসিস যে বৃহদাকার উপন্যাসের রেওয়াজ সৃষ্টি করেছে ইয়োরোপে, সেই মাপকাটিই একমাত্র প্রামাণ্য বিচার এবং ঔপন্যাসিক হিসেবে বঙ্কিম তাতে বাতিল।

গ্রীক নাটক হল ড্রামা, ব্যুৎপত্তিগতভাবে তার মূলকথা হল এ্যাক্‌শান এবং সেখানে বহির্জগতের গুরুত্বই বেশী এবং সেই ড্রামাটিক অ্যাকশানটাও বাইরের বস্তু।

ভারতীয় নাটক এবং অভিনয়ের ঐতিহ্য বহু প্রাচীন, এথেনীয় রঙ্গশালারও আগে ভারতে নাটক অভিনয় হয়েছে। শেক্‌স্‌পীয়ার, মার্লো, ম্যালিয়রের অনেক আগে আমাদের দেশে মৃচ্ছকটিক, শকুন্তলা, উত্তররামচরিত এবং ভাসের নাটকাবলী রচিত এবং বহুল অভিনীত হয়েছিল—এই সব নাটক গ্রীকড্রামার সমগোত্রীয় নয় তথাকথিত এ্যাকশনবর্জিত। কিন্তু সেগুলির জনপ্রিয়তা কিছুমাত্র কম হয়নি। বর্তমানে তা ইয়োরোপে ব্যাপকভাবে অভিনীত হচ্ছে এবং প্রচুর জনপ্রিয়তা অর্জন করছে। অবশ্য বিদেশে জনপ্রিয় হবার ফলে ওই সব নাটক সম্পর্কে ইদানীং আমরা কিছুটা আগ্রহ বোধ করছি। মস্কো ফরেন পাবলিশিং হাউস থেকে প্রকাশিত হয়ে এলে মহাভারতও এদেশে অনেক তরুণের হাতে হাতে কিংবা হ্যাভারসাকে হ্যাভারসাকে ঘুরবে, এমন মনে করা অস্বাভাবিক নয়। রবীন্দ্রনাথকেও আমরা স্বীকৃতি দিয়েছি নোবেল প্রাইজ পাবার পরে। অন্তর্দ্বন্দ্ব, কাব্যরস, ভাবাবেগ এবং ফুল থেকে ফলে পরিণতি—এই নাটকীয় ঐতিহ্য বহন করে রচিত বাঙলা নাটকের অভাব খুব নেই। কিন্তু গ্রীক ড্রামার সংজ্ঞা কিংবা ইবসেনীয়ান টেকনিক না হলে বাঙলা নাটক ব্রাত্য হয়েই থাকবে, এই মনোভাবই যত দীনতাবোধের মূলে।

বাঙ্‌লার নাট্যরীতির প্রবর্তক শ্রীচৈতন্যদেব এবং তিনিই অভিনয়কে রাজদরবার থেকে জনগণের মাঝখানে এনে দিয়েছিলেন। এই যাত্রাভিনয় আজকের দিনে বিদগ্ধ শহুরে মনকে তৃপ্তি দিতে পারেনা ঠিকই। একথাও ঠিক যে পাথুরেঘাটা, বেলগাছিয়া বা গিরিশ নাট্যদলের প্রেরণা এসেছিল এদেশের ইংরেজদের নাট্যশালা থেকে। তবু ঐতিহ্যের শিকড় তারা উপড়ে ফেলতে পারেননি এবং তাঁদের নাটকের বিষয়বস্তুতে ছিল জাতীয় জীবনের প্রকাশ। ভরত নাট্যশাস্ত্র এবং ভারতীয় তথা বাঙ্‌লা অভিনয়ের ঐতিহ্যে অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথ, আর রবীন্দ্রনাথ প্রবর্তিত রীতি প্রভূত প্রভাব বিস্তার করেছিল শিশিরকুমারের উপর।

শিশিরকুমারের অব্যবহিত পূর্ববর্তী অবস্থা আজ নব বঙ্গনাট্যশালায়, পরীক্ষানিরীক্ষা প্রচুর হচ্ছে। তবে নবনাট্য আন্দোলনকে যদি আমরা জাতীয় নাট্য আন্দোলন বলে মনে করি তার চেয়ে মারাত্মক ভুল আর কিছু নেই

আশ্চর্য একখানি প্রথম শ্রেণীর জনপ্রিয় দৈনিকের কলাম্‌নিস্ট লিখতে পারেন, আজকের দিনে 'সীতা' 'সিরাজদৌলা' অচল, অথচ একই নিঃশ্বাসে তিনি নবনাট্য আন্দোলনের সার্থকতা ঘোষণা করছেন 'পুতুল খেলা' ও ওথেলোর জনপ্রিয়তা দিয়ে।

অমৃতলাল গিরিশচন্দ্র দ্বিজেন্দ্রলালের সামাজিক নাটক বিষয়বস্তুর দিক থেকে আজও বাস্তব, কিন্তু পুতুল খেলা এদেশে আজকের ডিভোর্স-প্রচলিত সমাজেও অচল। ইবসেন হল যুগোপযোগী, ওথেলো হল যুগোপযোগী—হয়তো দেশ-সমাজোপযোগীও, আর অচল হল ভারতের পুরাণ কাহিনী, বাঙলার ঐতিহাসিক কাহিনী। এমন যুক্তি না হলে নবনাট্য আন্দোলন জাতীয় আন্দোলনের দাবী করে কি করে? 'সধবার একাদশী', 'নীলদর্পণ', 'একেই কি বলে সভ্যতা' 'অলীকবাবু' এইসব প্রাচীন নাটকের ঐতিহাসিক মূল্য যায় থাক না কেন, আজকের দিনে তার অভিনয়ের সার্থকতা 'কিউরিও' হিসেবে অথচ এগুলি আজ হয়ে উঠেছে নবনাট্য আন্দোলনের বাহন। বোধহয় পেশাদার নাট্যশালার ঐতিহ্যকে অস্বীকার করার প্রয়াসে। নবনাট্য আন্দোলনের আর একখানি উদাহরণ ছায়ানট। বোম্বেতে যাই হোক, বাঙলা সমাজজীবনের সঙ্গে টলিউড স্বীপ একেবারে নিঃসম্পর্কিত। 'কাজল' উপন্যাসের যদিবা সামাজিক সার্থকতা থাকে, কারণ 'কাজল'-এর চরিত্রগুলি আমাদের প্রতিবেশী। টলিউড জীবনের, বিশেষকরে স্টুডিওর ভিতরকার, সামাজিকতার কোন মূল্য আছে কি ব্যাপক সামাজিক সংস্কৃতিতে? নাট্যশালার পক্ষে ছায়াচিত্রজগতের প্রতি মুখ-ভ্যাংচানো প্রোফেশানাল এটিকেট্‌ সম্মত যদি বা হয়, তা অবশ্য আমাদের জানার কথা নয়।

দেবেন বসু, রচিত ওথেলো, গিরিশ ঘোষের ম্যাকবেথ এবং নগেন রায় চৌধুরী (অমর দত্তর নামে চালু হলেও) রচিত হ্যামলেটের অনুবাদ হরিরাজ অনেক আগেই কলকাতার পেশাদার রঙ্গমঞ্চে অভিনীত হয়েছে। বাঙালী দর্শক-মন তার রস স্বীকার করেনি। অত উগ্র ঈর্ষা, রাজতক্তের লোভে এত খুনোখুনি, দেবরের সঙ্গে ষড়যন্ত্র করে রাণীর পক্ষে স্বামী হত্যা—আমাদের মনের রসতন্ত্রীতে বিভীষিকা সৃষ্টি করে, যতই শেকসপীয়ারী কারুকার্য থাকনা কেন তাতে। বাঙলা দেশের মেয়েরা আজও পুতুলের ঘর করেনা। ডিভোর্স করে কিন্তু সিঁদুর মুছে চলে যায় না, যে যায় সে আর যাইহোক বাঙালী সমাজের কেউ নয়।

এইসব নাটক নিউ এম্পায়ারে তিনমাসে ছ-মাসে একদিন হয়, কিউরিও হিসেবে মন্দ লাগেনা। আর বড়লোক ফ্যাশানেবল যাঁরা রবিবার সকালের গুলতানিটা স্কাইরুমে না করে নিউএম্পায়ারে নাটক দেখা উপলক্ষ্যে করেন তাঁদের তৃপ্তি অতৃপ্তির কোন দামই নেই দু-দশটাকা তাদের খোলামকুচি, তাঁরা সময় কাটাতে, সামাজিকতা করতে যান, নাটক দেখতে নয়। সর্বশ্রেণীর লক্ষ লক্ষ লোক কষ্টার্জিত অর্থব্যয় করে যে নাটক দেখতে যায় রাতের পর রাত, সে নাটকই 'লোক নিয়েছে' আখ্যার পাত্র এই কথাই নবনাট্য আন্দোলনের প্রোপাগান্ডাওয়ালারা উপলব্ধি করলে ভালো হয়।

আজকের দিনে 'লোকে নিয়েছে' নাটকেও প্রকৃত বস্তুর অভাব কম পীড়াদায়ক নয়। মোটমাট পরিচ্ছন্ন প্রোডাকশান, অভিনয়ে তৃপ্তিদায়ক টিকওয়ার্ক-ই আজকের নাটকের 'লোকে নিয়েছে'র মূলে। কিন্তু প্রকৃত রসিকজনের রোমাঞ্চ জাগানো গিরিশ অমৃতলাল-অমরেন্দ্রনাথ-দানীবাবু—শিশির—অহীন্দ্র—দুর্গাদাস-এর এক একটা অঙ্ক-দৃশ্য আজ কোন নাটকে খুঁজে পাওয়া যায় না। আর নাটকেই বা সমাজজীবনের গভীরে নাড়া দেওয়া বিষয়বস্তু কোথায়।

নবনাট্য আন্দোলন হল এক্সপেরিমেন্টাল, তা 'জাতীয়' হতে হলে অনেক বন্ধুর পথ পার হয়ে যেতে হবে তাকে। আর পেশাদারী স্টেজ, তাও অন্যবস্তু। সেখানে বক্স-অফিস-এর দিকে দৃষ্টি রেখে সব কিছু করা, প্রয়োজন বোধে স্টান্ট দেওয়া। সইয়ে সইয়ে প্রকৃত সূক্ষ্মশিল্পের ডোজ ইনজেকশান দেওয়া। তবে সমাজ জীবনকে প্রতিফলিত করতে পারলে গণমনের নিরুদ্ধ ভাবাবেগকে প্রকাশ করতে পারলে অভিনয়ে শক্তিমান নট হৃদয় ঢেলে দিলে পেশাদারী নাট্যশালায়

সবদিক দিয়ে সার্থকতা আসতে পারে। জাতীয় নাট্যশালাকে ঐতিহ্যভিত্তিক হয়েও যুগের তথা জাতির অন্তরের বাণী বহন করতে হবে।

নবনাট্য আন্দোলনের 'ছেঁড়াতার' খাঁটি বাঙলা নাটক, 'চার অধ্যায়'-এর মূল রবীন্দ্রনাথ। কিন্তু 'পুতুল-খেলা' বাজারে ছেড়ে নব নাট্য আন্দোলনের দল প্রমাণ করেছেন সমাজ ও জীবন সম্পর্কে উদাসীন নাট্যপ্রচেষ্টা নিয়ে তাঁরাও বঙ্গ রঙ্গশালার সঙ্গে পুতুল খেলাই করছেন।

নবনাট্য আন্দোলনের নেতৃবৃন্দ শক্তিমান। কিন্তু তাঁদের শক্তির দম্ভে তাঁরা জাতীয় অতীতকে একেবারে অস্বীকার করছেন। আর টেকনিকের স্টান্ট দিয়ে বন্ধু সমালোচকমণ্ডলী ও এবং পাশ্চাত্যভক্ত উন্নাসিকদের সহযোগিতায় প্রভাব সৃষ্টির প্রয়াস করছেন। যেটুকু নাট্যবিদ্যা তাঁদের আছে পূর্বসূরীদের সম্পর্কে বিনয়বোধের অভাবে তা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হচ্ছে।

শিশিরকুমার সম্পর্কে বহু অশোভন উক্তি করা হচ্ছে। ইদানীং অমরেন্দ্রনাথ দত্ত প্রসঙ্গে নাকি বলা হয়েছে, কে এক অমর দত্ত।

অমর দত্তীয় অভিনয়পদ্ধতি আজ অচল একথা যেকোন বুদ্ধিমান ব্যক্তি স্বীকার করবেন, যেমন অচল বিদ্যাসাগরের গদ্য। তাই বলে আজ অচিন্ত্য সেনগুপ্তের গদ্যরীতির ভক্তিতে গদ্‌গদ হয়ে যদি বলি কে এক বিদ্যাসাগর (অবশ্য সাহিত্যিক হিসেবে), তবে সেই অর্বাচীনতা অসহ্য হয়ে পড়ে। অমর দত্ত কে সে পরিচয় ওঁদের জানা দরকার।

অমর দত্ত, মনীষী হীরেন দত্তর সহোদর, কলকাতার নামকরা বনেদীবংশজাত দ্বারিক দত্তের পুত্র। এতবড় প্রাচীন বনেদী বংশের ছেলের নাট্যশালায় যোগ দেওয়ায় সে যুগে বিরাট আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল এবং বড় বড় সাহেব সুবো অফিসার এবং এতদিন পেশাদার থিয়েটার থেকে সরে থাকা অনেক গণ্যমান্য ব্যক্তিকে তিনি থিয়েটারে নিমন্ত্রণ করে এনে পেশাদার রঙ্গমঞ্চের মর্যাদা বাড়িয়েছিলেন। ক্লাসিক থিয়েটারের মালিক-প্রযোজক হিসেবে তিনি দুহাতে পয়সা ঢেলেছিলেন। বিজ্ঞাপন হিসেবে প্রাচীর-পত্র ব্যবহার তিনিই প্রবর্তন করেছিলেন। পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়কে সম্পাদক ও মণিলাল বন্দ্যোপাধ্যায়কে সহ সম্পাদক করে তিনিই প্রথম বাঙলাভাষায় নাটক-অভিনয় সম্পর্কিত পত্রিকা প্রকাশ করেছিলেন। তখনকার সম্ভব মত ব্যবস্থায়। আলোকসম্পাত ও সিন-সেটিং-এর চমক তিনিই সৃষ্টি করেছিলেন। 'আলিবাবা' অভিনয়ের মাধ্যমে বাংলায় অপেরা প্রবর্তনের কৃতিত্বও তাঁর। গিরিশচন্দ্রের বুদ্ধদেব নাটকে 'কাঁর পুত্রের কামনা'—অংশে অভিনয়ে এমন প্রভাব সৃষ্টি করেছিলেন, যে কলকাতার বড় বড় বাড়ীতে তার ফলে দুর্গাপূজা উপলক্ষে জীববলি বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। এককথায় বাঙলা নাট্যশালাকে তিনি অনেকখানি এগিয়ে দিয়েছিলেন স্বল্পকালের কৃতিত্বে। নাট্যশালার জন্যই তিনি প্রাণ দিয়েছিলেন। ১০৪ ডিগ্রি জ্বর আসায় দর্শকদের তিনি অনুরোধ করেছিলেন বিষবৃক্ষ নাটকে নগেন্দ্র দত্তর পার্ট করার দায়িত্ব থেকে সেদিনের মত তাঁকে ছুটি দিতে। পরিপূর্ণ প্রেক্ষাগৃহ সমস্বরে তাঁর আবেদন নামঞ্জুর করেছিল। দর্শকদের টিকেটের মূল্য দিয়ে দেবার ক্ষমতা এবং উদারতা তাঁর ছিল, কিন্তু অভিনেতা হিসেবে তাঁর কর্তব্যবোধ তাঁকে খুঁচিয়ে অভিনয় করালে সেদিন এবং সেই তার শেষ অভিনয়।

দামোদরের বাঁধ হয়তো একদিন ভারতের জীবনে বিপ্লব সৃষ্টি করবে। তাই বলে গঙ্গার সঙ্গে মিলিত হয়েই দামোদরের জল যদি গোমুখী দেবপ্রয়াগ, হরিদ্বার, কাশীকে, অস্বীকার করে বলে আমিই গঙ্গা,—তাহলে সত্যের অপলাপে বৈচিত্র্য থাকে ঠিকই, কিন্তু সেটা কি সমীচীন?

প্রাচীন ভারতের সাধনা ও 'তপতী'

ভারতী সেনগুপ্ত

ছেলেবেলায় শুনেছিলাম রবীন্দ্রনাথের জন্মের আগে তাঁর মা ভোর বেলায় ছাদে দাঁড়িয়ে বহুক্ষণ প্রভাত-সূর্যবন্দনা করতেন। এই কাহিনীর প্রভাব আছে রবীন্দ্রনাথের সমস্ত জীবনের কর্মে, ধ্যানে ও ধারণায়। বাস্তবিক সূর্যের মত রবীন্দ্র-প্রতিভাও বিকশিত,—প্রজ্জ্বলিত। কবির ভাবজীবন সূর্যাগ্নিমন্ত্রে দীক্ষিত ঋষিতুল্য, প্রাচীন ভারতের উপনিষদের রসপুষ্ট ঋষিদের মতই রবীন্দ্রনাথ তাঁর সমস্ত জীবনে উপলব্ধি করেছেন রুদ্রের তেজ, ভৈরবের তাণ্ডবলীলা, অগ্নির দীপ্তি।

প্রাচীন ভারতের প্রকৃত সাধনা ছিল রুদ্রের সাধনা। ভারতের অন্তর্নিহিত এই ভাবরূপ কবির উপলব্ধিতে মূর্ত হয়ে উঠেছে তাঁর 'নববর্ষ" প্রবন্ধে। সেইরূপ রবীন্দ্রনাথেরই ভাবময় আত্মা।—

"যাহা আমাদের স্বরচিত, যাহাকে সমস্ত ভারতবর্ষের মধ্যে আমরা একমাত্র সত্য, একমাত্র বৃহৎ বলিয়া মনে করিতেছি, যাহা মুখর যাহা চঞ্চল যাহা উদ্বেলিত পশ্চিম সমুদ্রের উদ্‌গীর্ণ ফেনরাশি—তাহা, যদি কখনও ঝড় আসে, দশদিকে উড়িয়া অদৃশ্য হইয়া যাইবে। তখন দেখিব, ওই অবিচলিত-শক্তি সন্ন্যাসীর দীপ্তচক্ষু দুর্যোগের মধ্যে জ্বলিতেছে, তাহার পিঙ্গল জটাজুট ঝঞ্ঝার মধ্যে কম্পিত হইতেছে—যখন ঝড়ের গর্জনে অতিবিশুদ্ধ উচ্চারণের ইংরেজি বক্তৃতা আর শুনা যাইবেনা, তখন ঐ সন্ন্যাসীর কঠিন দক্ষিণ বাহুর লৌহবলয়ের সঙ্গে তাহার লৌহদণ্ডের ঘর্ষণঝঙ্কার সমস্ত মেঘমন্দ্রের উপরে শব্দিত হইয়া উঠিবে।" এই সন্ন্যাসী ভারতবর্ষ সংযমের দ্বারা, বিশ্বাসের দ্বারা ধ্যানের দ্বারা ভয়হীন আত্মসমাহিত। কিন্তু তার মুখশ্রীতে মৃদুতা এবং সজ্জার মধ্যে কাঠিন্য, লোক ব্যবহারে কোমল এবং স্ব-ধর্মরক্ষায় দৃঢ়। কবিবর্ণিত ভারতের এইরূপ আর কিছুই নয় উপনিষদের রুদ্ররূপ। কবি বারবার এই রুদ্রকে আহ্বান করেছেন তাঁর জীবনে—

"হে রুদ্র তোমারই দুঃখরূপ, তোমারই মৃত্যুরূপ দেখিলে আমরা দুঃখ ও মৃত্যুর মোহ হইতে নিস্কৃতি পাইয়া তোমাকেই লাভ করি।"

কবির অন্তরাত্মা প্রার্থনা করেছে—"আবিরাবীর্য এধি"—"হে আবিঃ তুমি আমার নিকট আবির্ভূত হও," তপোবনের ঋষিদের মত কবিও সেই 'প্রচণ্ড'কে 'প্রকাশ'কে করুণাময় বলে ব্যর্থ সম্বোধন করেন নি, তাঁদের কণ্ঠে কণ্ঠ মিলিয়ে উদাত্তসুরে প্রার্থনা করেছেন—"রুদ্র যত্তে দক্ষিণং মুখং তেন মাং পাহি নিত্যম্—" "হে রুদ্র, তোমার যে প্রসন্ন মুখ, তাহার দ্বারা আমাকে রক্ষা কর।" রুদ্রের এই প্রসন্নমুখের শক্তি হ'ল আনন্দের শক্তি, প্রেমের শক্তি। এই শক্তি অভাবের উপরে জয়ী, মৃত্যুর উপরে জয়ী। এই অভ্রভেদী শক্তি সেই মহান্তপুরুষ যিনি আঁধারের পারে জ্যোতির্ময়।

"বেদাহমেতং পুরুষং মহান্তম্ আদিত্যবর্ণং তমসা পরস্তাৎ"। এই মহাপুরুষ-কেই রবীন্দ্রনাথ প্রত্যক্ষ করেছেন নিজের জীবনে। তাকে রূপে রসে অন্তরে উপলব্ধি করেছেন—পরে সেই উপলব্ধিকে তিনি প্রকাশ করেছেন তাঁর গানে, কবিতায়, নাটকে ও প্রবন্ধে। এমনি একটি রসের প্রকাশ হ'ল রবীন্দ্রনাথের 'তপতী'।

নাটকের নায়িকা 'সুমিত্রা' রুদ্র ভৈরবের উপাসিকা। তিনি জালন্ধরের রাণী, কাশ্মীরের

কন্যা। প্রথম জীবনে তিনি ছিলেন কাশ্মীরের মার্ত্তণ্ডদেবের সেবিকা, পরে জালন্ধরের মহিষী হ'য়ে তিনি রুদ্র ভৈরবের তপস্যার দীক্ষা নিয়েছেন। এই রুদ্রের প্রসাদেই তিনি উপলব্ধি করেছেন প্রেমের অপরিমেয় শক্তি—তার সত্যরূপ।

'তপতী' নাটকটি রবীন্দ্রনাথের পরিণত বয়সের নাট্যসৃষ্টি। তাই এর মধ্যে কবির সামগ্রিক ভাবাদর্শ (প্রেমসম্বন্ধীয়) খুব স্পষ্টভাবেই উপলব্ধি করা যায়। প্রেমের অমৃতময় রূপে প্রণয়ের "সাধন কলা" মুখ্য নয়, এখানে ভাবের আবেগ প্রধানস্থান নিয়েছে, এতে প্রণয়ের "সাধনাবেগই প্রবল"। তাই তিনি প্রেমের দেবতাকে আহ্বান করেছেন রুদ্রমন্ত্রে—

"ভস্ম-অপমানশয্যা ছাড়ো পুষ্পধনু,
রুদ্রবহ্নি হতে লহ জ্বলদর্চিতনু।
যাহা স্মরণীয় যাক্ মরে
জাগো অবিস্মরণীয় ধ্যানমূর্তি ধরে।
যাহা রূঢ়, যাহা মূঢ় তব,
যাহাস্খলে দগ্ধ হোক, হও নিত্য নব।
মৃত্যু হতে জাগো পুষ্পধনু,
হে অতনু বীরের তনুতে লহো তনু।

সুমিত্রা নিজের জীবনে এই রুদ্র তেজময় প্রেমের আহ্বান করেছেন। এর সাহায্যে তিনি চেয়েছিলেন বিক্রমদেবের আসক্তিপূর্ণ প্রেমের বিনাশ করতে। তিনি বুঝেছিলেন প্রেমের "সেই দিব্যদীপ্যমান দাহ" সমস্ত রাজ্যের অকল্যাণকে দগ্ধ করে কল্যাণ ও শান্তি আনতে সক্ষম হবে। কিন্তু এর জন্য চাই কঠোর সাধনা। তাই সুমিত্রাও সমস্তজীবন শক্তিসঞ্চয়ের জন্য তপস্যা করেছেন রুদ্র ভৈরবের। তাঁর বৃহত্তম প্রেমের আদর্শ প্রতিষ্ঠাকল্পে (সে আদর্শ প্রজারক্ষা সাধনার ও রাজ্যের কল্যাণকামনা) তিনি জীবন পর্যন্ত বিসর্জন দিয়েছেন। তাঁর সাধনার এই পরমতেজ সূর্যকিন্যা 'তপতী' নামের দ্বারা ব্যঞ্জিত হয়েছে।

কাশ্মীরের শত্রু বিক্রমদেবকে কাশ্মীরের কন্যা সুমিত্রা বিবাহ করেছিলেন একমাত্র কাশ্মীরের প্রজারক্ষার করুণায়। বিক্রমদেব বলের দ্বারা কাশ্মীর জয় করার পর সুমিত্রা প্রথমে আত্মরক্ষাকল্পে অগ্নিতে প্রাণ বিসর্জন দিতে প্রস্তুত হন। কিন্তু পরে আপনরাজ্যের প্রজাবৃন্দের মঙ্গলকল্পে সেই প্রজ্বলিত অগ্নিকে সাক্ষী করে তিনি বিক্রমদেবের ধর্মপত্নী হয়েছিলেন। কাজেই দেখা-যাচ্ছে বিবাহের পূর্ব থেকেই তাঁর আদর্শরক্ষার কঠোর তপস্যা আরম্ভ হয়—তিনি প্রার্থনা করেছেন—"রুদ্রের প্রসাদে আমার বিবাহ যেন ভোগের না হয়।" এক নিরাসক্ত ত্যাগের মধ্যে দিয়ে তাঁর বধূজীবনের সূচনা। শেষপর্যন্ত এই ত্যাগ মৃত্যুর মধ্যে দিয়ে পরিপূর্ণ সমাপ্তি লাভ করলো।

বিক্রমদেবের প্রেমের প্রচণ্ডতার মধ্যে সুমিত্রা উপলব্ধি করেছিলেন ভোগাসক্তির রূপ। তিনি বুঝেছিলেন এই আসক্তির মধ্যে লুকিয়ে আছে রাজ্যের প্রজাসাধারণের অকল্যাণ ও সমস্ত রাজ্যের ধ্বংসের বীজ। তাই বিক্রমদেবের রাজ্যকে রক্ষার জন্য তিনি গোপনে যাত্রা করলেন কাশ্মীরে। কিন্তু এবারে আর কাশ্মীরের কন্যারূপে নয়—মার্ত্তণ্ডদেবের উপাসিকার দীক্ষা নিয়ে।

কিন্তু এই যাত্রার পূর্বে সুমিত্রা বারবার রাজার কাছে 'মহিষীপদ' 'রাণীর পদ', 'লোকমাতারপদ' প্রার্থনা করে রাজার সিংহাসনের অংশভাগিনী হ'তে চেয়েছেন। কারণ তিনি বুঝেছিলেন অন্তঃপুরের অবগুণ্ঠনতলে সমস্ত রাজ্য প্রদোষান্ধকারপূর্ণ, রাজ্ঞীর ছায়ায় রাজলক্ষ্মী ম্লান। সুমিত্রা বুঝেছিলেন তাঁর হৃদয়ের সম্পূর্ণ অংশ রাজার নয়, এক অংশ তাঁর রাজ্যের প্রজাবর্গের। কিন্তু বিক্রমদেব একথা স্বীকার করতে রাজী নন—তাঁর অহঙ্কার—তিনি সুমিত্রার প্রেমে রাজকর্তব্যকে পর্যন্ত তুচ্ছ করতে পেরেছেন। সুমিত্রা কিন্তু রাজার এই কর্তব্যবিস্মৃত প্রেমের কাছে নিজের ধর্ম-কর্ম, দ্বিধা-দ্বন্দ্বকে বিসর্জন দেননি। কারণ প্রেমের সাধনা তাঁর কাছে বড়কথা, এই শক্তি তিনি অর্জন করেছেন রুদ্রভৈরবের প্রসাদে। তবে বিক্রমদেবের প্রচণ্ড প্রেমের বন্যাকেও তিনি অস্বীকার করতে সমর্থ হননি—তাই প্রথম থেকেই নিজের সঙ্গে তাঁর অহরহ দুর্বিষহ স্বন্দ্ব চলছিল। এই স্বন্দ্বের মধ্যে দিয়েই আরম্ভ হয় তাঁর কঠোর তপস্যা। পরে তপঃস্বিনীর দীক্ষা গ্রহণ করাতেই তাঁর 'তপতী' নাম সার্থক হয়েছে।

সূর্য, অগ্নি ও রুদ্র যেমন তাঁদের তেজ, দীপ্তি ও প্রলয়ঙ্কর মূর্তিতে জগতের অন্ধকার পাপ ও কলুষ বিদগ্ধ করে জগতে মহত্তীকল্যাণ সাধন করেন, সূর্যের উপাসিকা সুমিত্রাও তেমনি 'তপতী' নাম নিয়ে রাজ্য ও রাজ্যের সব অকল্যাণকে দগ্ধ করে শান্তির প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছেন। এইখানেই তিনি সার্থক হয়েছেন সূর্য ও রুদ্রের উপাসিকারূপে। জালন্ধরে যিনি রুদ্র, কাশ্মীরে তিনিই সূর্যদেব মার্ত্তণ্ড। রবীন্দ্রনাথের ভাবপরিকল্পনায় সূর্য, রুদ্র ও অগ্নি সমধর্মী। এই জন্যই মার্ত্তণ্ডদেবের উপাসিকা জালন্ধরে এসে অনায়াসেই রুদ্রভৈরবের পায়ে স্থান খুঁজেছেন, বিশ্বজয়ের মন্ত্র ভিক্ষা করেছেন। তাঁর সব অপমান ও ব্যর্থতা থেকে মুক্তি ভিক্ষা করেছেন রুদ্রভৈরবের কাছে। এখানে মনে রাখা দরকার বিবাহের পূর্বে সুমিত্রা কৈলাশনাথের মন্দিরে তিন-দিন উপবাসী থেকে নিজেকে তপঃশুদ্ধা করে নেন। তাই রাজার কাছ থেকে প্রজারক্ষার অধিকার না পেয়ে অতি সহজেই তিনি নিজেকে বিক্রমদেবের প্রেমের উদ্দামতা থেকে সরিয়ে নিতে পেরেছেন। পরে এই তপের প্রভাবেই তিনি জালন্ধর ছেড়ে ফিরে গিয়েছিলেন সূর্য-মন্দিরে। সূর্যের ভূমিকা তিমিরবিদারী, তিনি সর্বকল্যাণকর। জগতের সব অন্ধকার, মালিন্য ও কলুষের বিরুদ্ধে তাঁর জয়যাত্র। সুমিত্রাও সমস্ত জীবনব্যাপী বিক্রমের প্রেমাসক্তির মালিন্যকে ধৌত করতে চেয়েছেন তাঁর তপোবলে। এখানেই তিনি সার্থক সূর্যের কন্যা।

সমস্ত জীবনই সুমিত্রার কেটেছে তপস্যা করে কিন্তু গৃহত্যাগের পর তিনি নিজেকে উপলব্ধি করেছেন 'তপতী' রূপে। কারণ এই সময় থেকেই তিনি প্রস্তুত হয়েছেন তাঁর তপস্যার পূর্ণাহুতি দেওয়ার জন্য। তিনি এই সময়ে উপলব্ধি করেছেন মহৎ প্রেম চরিতার্থ হয় মৃত্যুর মধ্যে দিয়ে। জীবন সঁপিয়া তবেই পাওয়া যায় জীবনেশ্বরের যথার্থ পরিচয়। তাই মৃত্যুকে এড়িয়ে গিয়ে অমৃত প্রেমের সন্ধান মেলে না, মৃত্যুকে পেরিয়ে যেতে হয়।

•

নাটকে সুমিত্রার রাণীর জীবন আরম্ভ হয়েছে অগ্নিসাক্ষী করে। এই অগ্নি একদিন তিনি জ্বালিয়েছিলেন প্রাণবিসর্জনকল্পে। তাঁর জীবন শেষ হয়েছে সেই আগুনে আত্মাহুতি দিয়ে। মাঝে সুমিত্রার বধূজীবন নিয়ন্ত্রিত হয়েছে রুদ্রভৈরবের মন্ত্রে। সুতরাং তাঁর সমস্ত জীবনে অগ্নি, রুদ্র ও সূর্যের প্রভাব সহজেই লক্ষ্য করা যায়। রবীন্দ্রমানসে অগ্নি রুদ্র ও সূর্য সমধর্মী। এই বিষয়ে তিনি কোন পৌরাণিক বা ঐতিহাসিক বিবর্তনবাদ গ্রহণ করেননি। নিজের

উপলব্ধিতে এঁদের ভাবরূপকে ব্যাখ্যা করেছেন মাত্র। এবং এই ভাবব্যাখ্যা রবীন্দ্রনাথের জীবনে আদর্শরূপে প্রতিফলিত হয়েছে।

"নববর্ষ" প্রবন্ধটিতে কবি প্রাচীন ভারতের যে আত্মিক রূপ মানসচক্ষে প্রত্যক্ষ করেছেন, তার সঙ্গে কোথায় যেন সুমিত্রার সাধনার একটা সাদৃশ্য খুঁজে পাওয়া যায়। "নিষ্ঠার যে কঠোর শান্তি, বৈরাগ্যে যে উদার গাম্ভীর্য" প্রাচীন ভারতের তপস্যার মধ্যে কবি উপলব্ধি করেছেন সেই রূপটিই কি আমরা সুমিত্রার সাধনার মধ্যেও উপলব্ধি করিনা? সুমিত্রাও প্রাচীন ভারতের মতই সংযমের দ্বারা, বিশ্বাসের দ্বারা, ধ্যানের দ্বারা মৃত্যুভয়হীন আত্মসমাহিত শক্তি অর্জন করেছেন রুদ্রভৈরবের চরণে নিজেকে সমর্পণ করে। ত্যাগ, বিশ্বাস, ধ্যান ও মৃত্যুভয়হীন আত্মসমাহিত শক্তি যেমন ভারতবর্ষের মুখশ্রীতে মৃদুতা এবং মজ্জার মধ্যে কাঠিন্য, লোক ব্যবহারে কোমলতা এবং স্বধর্ম রক্ষায় দৃঢ়তা এনে দিয়েছে তপতীর সুমিত্রার মধ্যেও আমরা এরই প্রতিফলন দেখতে পাই। সুমিত্রার মধ্যে রবীন্দ্রনাথ প্রত্যক্ষ করেছেন 'আত্মশক্তি'র পূর্ণ বিকাশ, নারীর 'সবলা' রূপ ও রুদ্ররূপী প্রাচীন ভারতের নির্ভীক আত্মা।

সান্নিধ্য

চিন্তামণি কর

ক্যাবারে ও রোজে

যুদ্ধের আসল গন্ডির মধ্যে পড়ে অন্য ভারতীয় ছাত্রদের মনে কি প্রতিক্রিয়া হয়েছিল বলতে পারি না। আমার নিজের অভিজ্ঞতাকে যদি সাধারণ অনুভূতির একটা পরিমাপ বলে ধরা যায় তা হলে বলব যে মনে কেবল কেমন একটা বিশ্বাসের ভাব এসেছিল মাত্র। যুদ্ধের সম্ভাবনা যতক্ষণ "হচ্ছে কিংবা হবে না" এই রকম অনিশ্চিত অবস্থায় ছিল তখনকার ধারণায় মনে হোত যে সংগ্রাম শুরু হলেই একটা দারুণ ভয়ে আড়ষ্ট হয়ে যাব। কিন্তু সেই সমস্যার আসল উপস্থিতিতে অবাক হলাম একটুও ভয় হচ্ছে না বলে।

ভারতীয় ছাত্ররা প্রায় সকলেই জুলাই মাসে 'ভ্যাকান্স' আরম্ভ হ'তে ফ্রান্সের বাইরে ছুটি কাটাতে চলে গিয়েছিল। একটি বাঙালি ছাত্র গিয়েছিল মস্কোতে। যুদ্ধ প্রায় আসন্ন সংবাদে প্লেনে সে তাড়াতাড়ি প্যারিতে ফিরে আসে। মস্কোতে পৌঁছে তার কিন্তু প্লেনএর টিকিট কিনে ফিরবার মত অর্থসংগতি ছিল না। তারপর মস্কোর এক নাগরিকের পরামর্শে তার বাড়তি ওভার কোট, স্যুট, জুতো, ঘড়ি, বর্ষাতি সব বেচে যে দাম সে পেয়েছিল তাতে প্লেনএর ভাড়া—অতিরিক্ত পয়সায় পথে জেনিভা থেকে নতুন স্যুট, কোট, ঘড়ি জুতো ইত্যাদি কিনেও কিছু উদ্বৃত্ত অর্থ নিয়ে ফিরে এল।

সে আফশোষ করে বল্ল যে রাশিয়ায় ইয়োরোপের পুরানো জিনিষ এত চড়া দামে বিক্রী হয় জানলে আরো কয়েকটা স্যুট ও জুতা, ঘড়ি সঙ্গে নিয়ে যেত এবং সেগুলি বিক্রী করে বেশ মোটা টাকা বানিয়ে সে প্যারিতে ফিরতে পারত।

তার কথা শুনে মনে হল রাশিয়ানরা যে বলে 'ক্যাপিতালিস্ত আওতায় বেড়ে উঠা মানুষের মন অন্যায় ও দুর্নীতির পাঁকে নেংরা হয়ে যায়' সেটা সব অত্যুক্তি নয়। পরিবর্তন ও শুদ্ধ করবার চেষ্টা না করে এমন নোংরা প্রবৃত্তির নায়কদের বাতিলের ব্যবস্থাকরা বোধহয় উচিত পন্থা।

প্যারীর ছোট্ট ভারতীয় ছাত্র সম্মিলনীর সম্পাদক ছিলেন গন। রুদে সোমরারএ তাঁর ঠিকানাকে ছাত্র সম্মিলনীর দপ্তর হিসাবে ব্যবহার করা হ'ত। কাজেই দেশের সঙ্গে সংযোগ রাখার মত নানা রকম ছাপান কাগজ, বিজ্ঞাপনী ও সেই সঙ্গে মাঝে মাঝে নানান খোঁজে আসা দু'একজন দিশী টুরিষ্ট মারফত রকমারি উড়ো গুজবী খবর ঐখানে জমা হোত। রঙ বেরঙের সেই সব খবর কুড়োতে আমরা গনের ডেরায় প্রায়ই জমা হতাম এবং তাতে বুড়ীছোঁয়ার মত বরে মনটা সাময়িকভাবে যেন দেশের মাটি পর্যন্ত একটা দৌড় দিয়ে আসত।

আমরা নিজেদের ভবিষ্যৎ ভাবনার চেয়ে যুদ্ধ বাধলে বেচারী গনের মানসিক পরিস্থিতি কি হবে সে সম্বন্ধে রীতিমত উদ্বিগ্ন ছিলাম। কারণ অতি নিরীহ প্রকৃতির মানুষ গন যুদ্ধ আসায় নিজের অস্বাভাবিক মরণকে বহু রকমে ঘটবার কল্পনা করে প্রায়ই আচ্ছন্ন হয়ে বসে থাকতেন। এর উপরে আবার ভারতীয় টুরিষ্টদের কেউ কেউ সমস্যার বেঝ্যা মাঝে মাঝে উপস্থিত করে প্রায় তাঁর হার্টফেল এর সম্ভাবনা আনতেন।

জানার মত কোন খবর ছাত্র সম্মিলনীতে এসেছে কিনা একদিন খোঁজ নিতে গিয়ে দেখি

গন ও আর একটি বাঙালি ভদ্রলোক চুপচাপ বসে আছেন। ঘরে বেশ একটা থমথমে ভাব জমে উঠেছে দেখে বুঝলাম একটা কিছু বিভ্রাট ঘটেছে।

গন আমায় দেখে বল্লেন "বেশ হয়েছে আপনি এসে গেছেন এবং ভদ্রলোককে উদ্দেশ্য করে বল্লেন "আপনার সব কথা এঁকে জানান ইনি আপনাকে ভাল উপদেশ দিতে পারবেন।

তাঁর কাছ থেকে যে ঘটনাটি শুনলাম তার সারাংশ হচ্ছে যে তিনি ইয়োরোপের নানা শহর দেখবার যান বাহনের অগ্রিম টিকিট কিনে সবদেশ ঘুরে শেষ দ্রষ্টব্য প্যারিতে এসেছেন দুদিন হল। যুদ্ধ লাগলেও তাঁর কোন মুস্কিলে পড়তে হবে না কারণ দেশে ফিরবার প্লেনের টিকিটের ব্যবস্থা অগ্রিম হয়ে আছে বলে। তাই তিনি নিশ্চিন্ত মনে এই শহরে যতপ্রকার প্রমোদ উপভোগের রঙ্গালয় আছে সেগুলির সুখস্মৃতি নিয়ে দেশে ফিরবার উদ্দেশ্যে সফর করছিলেন।

নৈশাহারের পর পান ও নৃত্য আমোদের যে সব ব্যবস্থা আছে তার মধ্যে ক্যাবারেগুলি হচ্ছে টুরিষ্টদের একটি প্রধান আকর্ষণ। সেখানে সাধারণ পানশালার চেয়ে অনেক উচ্চহারে মূল্য দিয়ে একটা পানীয় কেনা বাধ্যতামূলক। এই দামের বদলে পাওয়া যায় সেখানে বসে গান ও বাজনা শোনা ও নাচ দেখা বা না দেখার অধিকার। কেউ ইচ্ছে করলে জনপ্রতি পানীয় কিনে স্ত্রী বা সঙ্গিনীকে এনে অর্কেস্ট্রার সঙ্গতে রাত্তিরের প্রায় সবক'টা প্রহর নেচে কাঁটিয়ে দিতে পারে।

মাঝে মাঝে নাচের আমোদে বৈচিত্র্য আনতে হয় সাময়িক বিরতি যখন শুরু হয়, 'আট্রাকসিয়ঁ' অর্থাৎ দর্শকদের চিত্ত বিনোদনের বিশেষ ব্যবস্থা। সব আলো নিভিয়ে দিয়ে কেবল নৃত্য মঞ্চটি স্পট্‌লাইট্‌ এর আলোয় প্লাবিত করে দেওয়া হয়। প্রায় বিবসনা নর্তকীরা একক যুগ্ম, বা অনেকে সমবেতভাবে দেহের নগ্নতাকে প্রকট করে যে অঙ্গভঙ্গী ও নাচ আরম্ভ করে তার আসল উদ্দেশ্যকে বিশদ ব্যাখ্যায় কাউকে বুঝবার প্রয়োজন হয় না। এই উৎকট নগ্নতার পরিবেশনকারিণীদের ফটোগুলি ক্যাবারের প্রবেশদ্বারের সামনে বড় বড় গ্লাসকেস্‌এ আনন্দ সওদাকারিদের দৃষ্টি আকর্ষণ এর জন্য সাজান থাকে।

ভদ্রলোক গিয়েছিলেন একটি ক্যাবারেতে এবং প্রায় রাতের শেষে সব নাচ গান শেষ হয়েছে ঘোষণা করলে তিনি নজর করেন যে বাইরের গ্লাসকেস্‌এ যত নর্তকীদের ছবি ছিল তাদের সকলকে আসরে দেখান হয় নি। তিনি দাবী জানান যে তাদের হাজির করে নাচ না দেখান পর্যন্ত তিনি ক্যাবারের বাইরে যাবেন না এবং অন্যথায় তাঁকে মূল্যের কিছু অংশ ফেরত দিতে হবে।

ক্যাবারের কর্মকর্তারা তাঁকে বহুরকমে বুঝাবার চেষ্টা করেন যে যুদ্ধ আসায় প্রাণের ভয়ে তাদের অনেকে শহর ছেড়ে পালিয়ে গিয়েছে কাজেই তাঁদের হাজির করা সম্ভব হয়নি।

তিনি তার জবাবে বলেন যে বাইরে সে খবরটা জানিয়ে দেওয়া উচিত ছিল অথবা তাদের বদলী নর্তকীর ব্যবস্থা। তা যখন করা হয়নি তখন মূল্যের খানিকটা তাঁদের ফেরত দিতে হবে।

এই নিয়ে বেশাকিছু বচসা ও রাগারাগী ব্যাপার হয়ে গেলে ক্যাবারের লোকেরা তাঁকে অর্ধচন্দ্র সহকারে রাস্তায় বের করে দেয়। তিনি তখন একটি পুলিশকে ডেকে নিয়ে আসেন এবং তাকে ক্যাবারের লোকেরা কি বুঝিয়ে দেওয়ায় সেও বেশ উত্তমমধ্যম দিয়ে তাঁকে নিষ্কান্ত করে দেয়। তখন তিনি ফরাসী একটুও জানতেন না তাই থানা থেকে তাঁকে বলা হয়েছে যে তিনি যেন ফরাসীজানা তাঁর স্বদেশবাসী কাউকে নিয়ে এসে সালিসীর ব্যবস্থা করেন। তাই তিনি এসেছেন ভারতীয় ছাত্রের কেন্দ্রে তাঁর প্রতি অবিচার ও অত্যাচারের প্রতিশোধ ব্যবস্থায় সাহায্যপ্রার্থী হয়ে।

মানুষ সমাজ ও দেশাচারী অনুশাসন এর কড়া দৃষ্টির গণ্ডীর মধ্যে যতক্ষণ আবদ্ধ থাকে ততক্ষণ সে তার উদ্দাম আদিম ইচ্ছা, প্রবৃত্তি ও ক্রিয়াকে লাগাম টেনে সংযত করে রাখে। কিন্তু সেই আবেষ্টনীর সীমানা পার হয়ে বেরুলেই তার সব সংযমের বাঁধনগুলি ঢিলে হ'তে হ'তে সে হয়ে পড়ে আর এক প্রকৃতির মানুষ। যাদের নজরে পড়লে সমাজঅনুশাসনবিরোধী ক্রিয়ার জন্য তাকে অপরাধী ও অনুশোচনাগ্রস্ত হতে হ'ত, তাদের দৃষ্টির বাইরে পড়ায় বেড়ে যায় তার সবকটি নিষিদ্ধ ফল ভক্ষণের লালসা, প্রয়াস ও আয়োজন। সব দেশ ও সমাজের অনেক মানুষকে দেখা যায় যে ধরাবাঁধা নিয়মের বাইরে গেলেই করে ফেলে কতকগুলি সৌখিন অপরাধ এবং নিজস্ব সমাজের এলাকায় ফিরে সেগুলিকে ফেলে দেয় মনের গোপন কাবার্ড এর গভীরে।

নীতিবাগিশরা যতই শিউরে উঠুন না কেন এ ছোটখাট চোরা অপরাধ মানুষে করে চলবেই এবং এতে সমাজের নৈতিক আধারে টোল লেগে যাবার কোন ভয় নেই, যতক্ষণ সেই অপরাধের পুনরাবৃত্তি সে করছে না নিজের সমাজে।

কিন্তু আমাদের সামনে বসে থাকা এই বঙ্গসন্তানটি কেবল পরদেশে একটা চোরা সখ মিটাবার চেষ্টা করেছেন তা নয় তিনি সেই সঙ্গে ছিটিয়েছেন নিজের দেশ থেকে আমদানী করা নোংরা ও নীচ মনের পাঁক ও দুর্গন্ধ।

মনে হল তার উপস্থিতি গনের ঘরখানা যেন দূষিত করে তুলেছে। ফরাসীতে গনকে বল্লাম "এই অধম জানোয়ারটাকে এতক্ষণ এখানে বসতে দিয়েছেন কেন? অনেক আগেই একে দরজা দেখান উচিত ছিল।" তারপর লোকটিকে বল্লাম "মশাই ফরাসী জেলখানা সম্বন্ধে আপনার কোন ধারণা আছে কি? সেখানে শুকরও বসতে কি শুতে অসোয়াস্তি বোধ করবে। কিন্তু আপনি সেখানে বেশ দীর্ঘকাল ধরে বসবাস করবার ভাল বন্দোবস্ত করে ফেলেছেন দেখছি। আপনার এই আমাদের দেশের নামোল্লেখকারী কেরামতির জন্য নিশ্চয়ই তারিফ করা উচিত। কিন্তু আপনি যদি আর বেশীক্ষণ এখানে অপেক্ষা করতে থাকেন তা হলে ঐ ক্যাবারে কর্তৃপক্ষের উদারহরণে আপনাকে অভিনন্দন করবার লোভ সংবরণ করতে পারা আমাদের পক্ষে মুস্কিল হবে।"

ভদ্রলোক বেশ উত্তেজিত হয়ে একটি বক্তৃতা দিলেন যে আমাদের দেশের লোকেরা নিজেদের জাতভাইদের বিদেশে বিপন্ন হলে সাহায্য করতে এগিয়ে আসে না। সাধে কি আমরা পরাধীন হয়ে আছি। তার মতে ভারতীয় ছাত্ররা ইয়োরোপে এসে কেবল নিজেদের পিতৃঅর্থনাশ করেছেন কারণ এদেশের উচ্চশিক্ষা ও কৃষ্টির আদর্শের কিছুটাই নিতে পেরেছেন বলে তাঁর মনে হয় না।

হেসে বল্লাম "ফিরেছেন তো প্লেনএ কিন্তু ইয়োরোপীয় কৃষ্টির যে বিরাট বোঝা আপনি সংগ্রহ করে সঙ্গে নিয়ে চলেছেন তার ভারে প্লেনটি মাটি ছেড়ে উড়তে পারবে বলে আপনার মনে হয় কি?"

গন বল্লেন "মশাই অক্ষত শরীরে দেশে ফিরবার সৌভাগ্য হলে সেখানে গিয়ে না হয় গায়ের ঝাল ঝাড়বেন। কিন্তু এখানি যদি কোন প্লেন ধরে ফ্রান্সের সীমানা ছাড়বার ব্যবস্থা না করেন তা হলে বাকি জীবনটা আপনাকে ফরাসী-শ্রীঘর বাসে কাটাতে হবে। কে জানে হোটেলে ফিরলে হয়ত দেখবেন পুলিস এতক্ষণে ভ্যান নিয়ে আপনাকে সেখানে নিয়ে যাবার জন্য অভ্যর্থনা করতে তৈরী হয়ে অপেক্ষা করছে।" ব্যাস্, আমাদের আর কিছু বলতে হল না। তিনি লগুড়াহত কুকুরের মত দ্রুত নিষ্কান্ত হয়ে গেলেন।

ভেবেছিলাম সখের ভ্রমণে আগত প্যারিতে দেশী পর্যটককুলের বুঝি ঐ শেষ আবির্ভাব। কিন্তু ঐ ঘটনার দু'একদিন পরেই এক বন্ধুর কাছ থেকে পরিচয়পত্র নিয়ে হাজির হলেন আর এক বঙ্গবাসী। এঁর অবশ্য সৌখিন অভিলাষের ফর্দটা খুব বড় ছিল না। ইনি ছিলেন সুরা-দেবীর অননামনা সাধক। ফরাসী না জানায় দু'দিন ঠিকমত পানীয় গলনালীতে না পড়ায় তাঁর মনে হচ্ছিল সর্ব শরীরের রস শুকিয়ে যাওয়ায় তিনি "বম্বেডাক্"এ পরিণত হয়েছেন। অতিশীঘ্র যদি কড়া সুরার টনিক্ তাঁকে না দেওয়া হয় তো তিনি নিশ্চয়ই "ফসিল্"এ রূপান্তরিত হয়ে যাবেন।

তাঁকে বল্লাম, "আপনার বর্তমান শারীরিক ও মানসিক অবস্থা দেখে আমার মনে পড়ছে কোথায় যেন শুনেছিলাম একটি গান—

"জয় মা কালী জয় মা কালী
এই বর দে মা মুণ্ডমালী
যতই কেন বদনে ঢালি
বোতল যেন হয় না খালি।"

তিনি বল্লেন "ঠিক বলেছেন মশাই সাঁতাই যদি এই বরলাভ সম্ভব হয় তো তার জন্যে যে কোন শক্ত রকমের তপস্যা বলুন আমি করতে রাজি আছি। তবে ঠকাবেন না স্যার সেটা কিন্তু সুরা-পানকে বাদ দিয়ে নয়।"

তাঁর তীব্র সুরাপানের প্রয়োজনটা কতখানি তার একটা পরীক্ষা করবার লোভ হল। নিয়ে গেলাম তাঁকে ক্যাফে উপ্যারিয়ায় এবং গার্সঁকে বল্লাম "রোজে" মদিরা আনতে। "রোজে" কেবল নামেই মদিরা, খাঁটি আঙ্গুরের রস বল্লে অত্যুক্তি হবে না এবং মাদকতা শক্তি প্রায় না থাকায় এ মদিরা শিশুকে পর্যন্ত বিনা দ্বিধায় পরিবেশন করা যায়। এর রঙটি সুন্দর গোলাবী টোন্-এ টলটলে যার জন্যে গোলাপের নামে এর পরিচয়। কিন্তু তাঁকে বল্লাম "এটি একটি অতিশয় চড়া মদ খেয়ে ঠিকমত সহ্য করতে পারবেন তো? শোনা যায় প্রথম যখন এটিকে রসান হচ্ছিল ঘ্রাণে আকৃষ্ট হয়ে শয়তান নাকি এসে চেখে ফেলায় তার উচ্ছিষ্টস্পর্শে এর তীব্রতা প্রায় এখন নাইট্রিক এ্যাসিডের মত জোরালো।"

তিনি বল্লেন "আঃ আপনার কথা যেন আমার কানে ঐ সুধা ঢেলে দেহকে অমৃতময় করছে। সুরায় আঘ্রাণ ও বিলম্বিত পানের তিনি একটা ওস্তাদি ঢঙ্ দেখিয়ে বোতলটিকে নিঃশেষ করলেন। তারপর মুহূর্তে নেশায় মশগুল্ হয়ে গুনগুনিয়ে ধরলেন তান।

জানলাম যে মদ্যপায়ীকে তীব্রসুরার ভ্রম দিয়ে রাঁগন জল পান করালেও মৌতাত ঠিক-মত জমে যেতে পারে। অবশ্য এ ফাঁকি কেবল বোধ হয় আমাদের দেশের মৌতাত অন্বেষী লোকদের উপরই চালান যায়।

আমাদের দেশে মদ খাওয়ার মুখ্য উদ্দেশ্য হচ্ছে মাতলামী করা এবং সুরাপায়ীদের চরিত্র সম্বন্ধে দেশীয় সাহিত্য ও নাটক যা বর্ণনা দেয় সেটা যে অবাস্তব নয় তা প্রমাণ করতেই যেন তারা সাধারণত মত্ততার দারুণ এক্সিবিসান্ করে। কারণবারী এদের কণ্ঠনালী আশ্রয় করলেই পিক্আপ্ এর পিন্ রেকর্ডে পড়ামাত্র গান বেরুনর মত বেরিয়ে আসবে রকমারী সুরের গীত অথবা তাঁরা পাঁট কি চার্চিলকে হার মানিয়ে দেবার মত বক্তা হয়ে আরম্ভ করবেন উদ্ভট পুরাণের ব্যাখ্যা। অনেক সময় তা আবার হয়ে পড়বে অশ্লীল পাঁচালী যা করে তুলবে শ্রোতাদের

কান পয়ঃপ্রণালীর মত দূষিত। আর তাঁরা পালা করে যদি মৌতাতে বেরসিকা পত্নীকে উত্তম-মধ্যম ধর্ষণে সেবা না করলেন তা হলে তো মদিরার জন্য খরচটা একেবারে বরবাদে গেল। মদ্য-পায়ীদের মধ্যে যাঁরা "পড়ে লিখে আদমী" তাঁদের অনেকে আবার উল্লেখ করে থাকেন বৈদিক যুগ থেকে নাকি আমাদের দেশে সোমরস পানের রেওয়াজ শুরু হয়েছে। এত শতাব্দি যখন ইতিহাস এ অভ্যাস সহ্য করে এসেছে আজ বাপু তাকে নাশ করবার জন্য এত বাড়াবাড়ি কেন! ঠিককথা কিন্তু তফাৎ এইটুকু যে বৈদিক আমলের লোকেদের সোমরস নেবার উদ্দেশ্যছিল শরীরকে বলশালী করে দৈত্যদানব দলনের জন্য তৈরী থাকা। দৈত্যদানবের যুগ শেষ হয়ে যাওয়ায় আজকের বীরগণ বার্লি, যব, এ্যাপেল ও দ্রাক্ষার জারক্রস সেবনে টনিকে সাময়িকভাবে শৌর্য বীর্যকে টনটনে করে হয় করেন গৃহিনী দলন আর না হলে ক্লাবে গিয়ে বকযন্ত্রের শাণিত অস্ত্রে নিপাত করে চলেন উপরওয়ালা কিংবা সরকারকে। আর সমাজের নিম্নস্তরের লোকেরা বৈদিক যুগ আর সোমরসের খবর না রাখলেও মদ্যপানে করবে ইতরজনোচিত হল্লা, দাঙ্গা হ্যাঙ্গামা কিংবা খুনখারাবি। কাজেই এর বিরুদ্ধে গান্ধীজীর মত অহিংসধর্মীকেও নিষেধ-যষ্ঠি তুলতে হয়েছিল হিংস্রভাবে। আমাদের দেশের লোকেরা যদি পশ্চিমী দেশবাসীদের মত সুরাসেবকে সাধারণ পান আহারের মাত্রায় নিয়ন্ত্রিত করে সমাজগত শালীনতা না বজায় রেখে চলতে পারে তা হলে মদ্যপান নিষেধের নিয়মকে উচিত বিধি হিসাবে এদের মেনে নিতে হবে।

ক্যাফের জনপ্রিয়া গায়িকা গাইছিল যুদ্ধের প্রারম্ভে রচিত সকলের প্রিয় মর্মস্পর্শী গান "জাতান্দ্রে তুজুর এ লা এ নুই জাতান্দ্রে তঁ রেতুর।" (তোমার ফিরবার অপেক্ষায় বসে থাকব সর্বদা দিবারাত্র)।

ক্যাফেতে উপস্থিত ফরাসী জানা তার সঙ্গে কোরাস গাইছিল। এ যেন সমবেত কণ্ঠের গান নয় এক জনতার বুকভাঙ্গা ক্রন্দনের কোরাস্। এই জনমণ্ডলীতে শুধু ফরাসী নয়, ছিল হিটলার বিতাড়িত অস্ট্রিয়ান, চেক্, হ্যাঙ্গেরিয়ান, প্যানিস, পোল ও জার্মান রেফিউজিরা। এদের আর কোথাও পালাবার ঠাঁই নেই। নিরাশ্রয় হয়ে এরা এসে জমা হয়েছিল এই শহরে অভয় ও আশ্বাসের অন্বেষণে। কিন্তু যুদ্ধের বিস্তারিত হস্ত ধ্বংস ও মৃত্যুর জাল ফেলে কেড়ে নিতে ব্যগ্র হয়েছে এদের সে আশাটুকুও।

এরা গাইছে মহাবিদায়ের গান, মুখে উচ্চারণ করছে বিদায়ী প্রিয়জনের ফিরবার দিন অপেক্ষা করে থাকবে কিন্তু তাদের অন্তরের মর্মান্তিক বেদনা জানাচ্ছে পুনর্মিলনের সব আশাকে বিদায়ের এক মহা যবনিকা চিরকালের মত বিচ্ছেদে বিচ্ছুপ্ত করে দেবে।

এদের কোরাসের সুরে সুর মিলাবার চেষ্টা করছিলেন 'রোজে'র নেশায় মশগুল আমার সঙ্গীটি। এতগুলি বেদনাশ্রুভরা চোখ ও বিষাদে বিকৃত এতগুলি কণ্ঠের বিদায় ধ্বনির মাঝ-খানে স্বচ্ছন্দ মদিরার বিলাসও তার আমেজে সুরের গুনগুনানি আমার অসহ্য হোল। জানিয়ে দিলাম ভদ্রলোকটিকে যে এখানে বসে থাকার অধিকার আমাদের আর নেই।

হতভম্ব হয়ে তিনি কিছু বলবার আগেই তাঁকে টেনে নিয়ে বেরিয়ে গেলাম ক্যাফে থেকে।

এক ছিল কন্যা

স্বরাজ বন্দ্যোপাধ্যায়

সার্চ শেষ করে ইনস্পেক্টর ওদের কাছে আসে।

—আপনাদের একটু যেতে হবে আমাদের সঙ্গে।

—চলুন।— বলে কাবেরী।

কমল একটু ইতস্তত করে।— মা।

মৃগনয়নী তাকায়। পাথরের চোখ এক ফোঁটা জলও নেই।

—মা!— গলাটা কেন কাঁপছে কমলের। ওঁকি কিছু বলবে। কি বলবে? আর কি বলবার আছে? এর পরেও কি আর কথা থাকতে পারে?

—মা যাই।— কমল এসে মৃগনয়নীর পায়ের পাতার ওপর মাথাটা রাখে।

কি বলবে মৃগনয়নী? আশীর্বাদ করবে? কথা বলবে? কাঁদবে?

—সিগ্গির উঠুন।— ধমক দেয় ইনস্পেক্টর।

কমল ওঠে। পুলিশের সঙ্গে আস্তে আস্তে নীচে নামে। পা আর চলে না। পা দুটো এত ভারী। আর মাথাটা? বড্ড ভারী লাগছে। পেছন পেছন পুলিশের দল বেরিয়ে যায় বাড়ী থেকে।

ঊনত্রিশ

তারপর? কলম আর আমার নড়ছে না। লিখতে পারছি না আর। এর পরে কি লিখব। মৃগনয়নীর কথা আরও কি কিছু থাকতে পারে। ওর নিজের কথাগুলো শুধু কানে বাজছে,—খোকাকে ওরা নিয়ে যাবার পর বাইরের চৈতন্য যেন সব লোপ পেয়ে গেল বাবা। কি জন্যে যে কি হোল কিছু যেন বুঝলাম না। এত পরীক্ষেও করে! হাসত মৃগনয়নী।

একেও পরীক্ষা বলেন?

আর কি বলব বাবা! ঠিক ঠিক চোখ মেলে যদি দেখ তবে হাসিই পাবে? অনেক সময় মনে হয়—। মৃগনয়নী যেন কোথায় ডুবে যায় বলতে বলতে।

কি? কি মনে হয়?

অনেক দূর থেকে যেন বলে মৃগনয়নী। মনে হয় এত বছরের জীবনটা যেন একটা বড় স্বপ্ন। তাই ত ঘুম ভেঙে হাসিই পায় ভাবলে মিছিমিছি কত ভয় পেয়েছিলাম। কত কেঁদে ছিলাম। ঠিক বুঝলে না বোধহয়? এত চালাকি দিয়ে বোঝবার জিনিষ নয়। চুপ করে থাকি কিছুক্ষণ। কত কি ভাবি। যাক, আমার ভাবনার কথা। যা বলছিলাম। কমলকে পুলিসে নিয়ে যাবার পর অচৈতন্য হয়েই পড়েছিল মৃগনয়নী। যদিনা কমলের মা না আসত। তবে হয়ত ওইখানেই আমার কাহিনী শেষ করতে হোত। কমলির মা পুলিশ বেরিয়ে যাবার পর ছুটতে ছুটতে ওপরে এল। এসে চক্ষুস্থির। চোঁচামেচি করে লোক জড় করে গরম দুধ খাইয়ে চোখে মুখে জল দিয়ে জ্ঞান ফিরিয়ে আনতে হোল মৃগনয়নীর।

—ওমা ভিরমি আর খাবেনি? কি কপাল করেই জন্মেছিল বাপু।

ভবানীর মা বললে,—তবে কথা কি, বাঘে ছুঁলে আঠারো ঘা। বাড়ীতে পুলিশ ঢুকল। কমলির মা বলে,—একি ছ্যাচড়ামী করে পুলিশ ঢুকেছে। এরা স্বদেশী ছেলে। সোনার টুকরো ছেলে সব। পুলিশ মুখপোড়ারা এদেরই ধরচে আজকাল। ভবানীর মা বলে,—মেয়েটিকেও ত' নিয়ে গেল।

—তা আর নেবেনি, ওত' ওদেরই দলের।

ভবানীর মা চলে যায়। কমলির মা মৃগনয়নীর পাশে বসে। হাওয়া করে।

—থাক দিদি। আর বাতাস করতে হবে না।—ক্ষীণস্বরে বলে মৃগনয়নী।

কিছুক্ষণ পর কমলির মা চলে যায়। জানিয়ে যায়, আজ মৃগনয়নীর ভাতে ভাত সে করে দেবে। মৃগনয়নী যেন শুয়েই থাকে। মৃগনয়নী শুয়ে থাকে ঠিকই। ধীরে ধীরে নিজের অবস্থাটা বোঝবার চেষ্টা করে। বোঝবার আর আছেই বা কি! সামনে শুধু অন্ধকার। অন্ধকার? না, অন্ধকার কেন হবে! বহুদিন পর রামতারণকে স্পষ্ট দেখতে পায় মৃগনয়নী। জ্যোতির জোয়ারে ভেসে এল যেন। মুখে প্রশান্ত হাসিটুকু। ঠাণ্ডা শীতল দৃষ্টি চোখে। কি অভয়! আর শান্তি! অনেকক্ষণ। অনেক সময় এক ভাবেই থাকতে হয় মৃগনয়নীকে। এই এক চিন্তায় ধুয়ে ওঠে যেন ও। মনে প্রলেপ নয়। ধুয়ে যায়। মুছে যায়। একটু কষ্ট লাগে না আর। একটু চিন্তাও কি হতে নেই? না। সব যেন স্পষ্ট হয়ে উঠছে চোখের ওপর। একটার পর একটা সুতোয় বাঁধা দিনের পর দিন। মুহূর্তের পর মুহূর্ত। অবধারিত কতকগুলো জীবনের পর জীবন। অশান্ত কাল আকাশটা কত বড়! আর ও নিজে? ও নিজে যে অনেক বড়! সেখানে আর আজ আর কালের কথা আর মুহূর্ত তরঙ্গের মত মিলিয়ে গেছে। যেন অনন্তহীন সাগরে। কে আর ভাবে। একটুখানি কথা। সে মন আর খুঁজে পাচ্ছে না ও। কমলির মা এসে না ডাকলে ও হয়ত বহুক্ষণ ওই ভাবেই পড়ে থাকত।

—তোমার ভাত আনব?

মৃগনয়নী তাকায় কমলির মায়ের দিকে। এই প্রথম সেই সুন্দর মধুর হাসি আসে ঠোঁটে।

—থাক। আমি যাচ্ছি।

—তুমি উঠোনি।

মৃগনয়নীকে আরও একবার হাসতেই হয়,—ভয় নেই, উঠতে পারব। উঠে গামছাখানা নিয়ে কলঘরে যায়। মাথায় জল ঢালে। শরীরটাও ঠাণ্ডা হয়। ওপরে এসে কাপড় ছেড়ে কমলির মাকে বলে,—চলো। যেন কিছুই হয়নি।

কমলির মা একটু ভয় পেয়ে যায়,—এযে দিব্যি হাসচে, কথা বলচে, মাথা ঠিক আছে ত', না, ঠিকই ত' কথা বলছে সব। কে জানে বাপু! কিছু বোঝবার উপায় নেই।

ঘরে এসে ওকে ভাত বেড়ে দেয়। একবার বলবার চেষ্টা করে,—কি আর করবে বল, সবই অদেষ্ট!

—না। করব কি? এ হয়ত ভালই হয়েছে। নইলে নিজেকে ছাড়িয়ে দেবার আনন্দটুকু হয়ত জীবনেও পেতুম না।

——আনন্দ! ভাল হয়েছে! মাথা খারাপ হয়নি ত'! কমলির মা বিমর্ষ হয়ে পড়ে। একে আর কি সান্ত্বনা দেবে ছাই! ভেবেছিল দুটো মিষ্টি বাক্য, মহাভারতের কথা বলে বোঝাবে

ওকে! বেশ ভাল লাগত তবে। কিন্তু এযে নিজেই বলছে আনন্দ লাগছে! বড়ই বিমর্ষ হয়ে পড়ে কমলির মা। মাগীর তেজ আছে! স্বামীপুত সব খেয়েও বলে আনন্দ! বলেহারী! যতটা ভাত খাবার খেয়ে ওঠে মৃগনয়নী।

কমলির মা আর একবার চেষ্টা করে,—তোমার ভাসুরের ওখানে খবর পাঠাব?

—থাক। ওদের আর বিরক্ত করতে চাইনে।

আর কথা নয়। কমলির মা আশা ছেড়ে দেয়। মৃগনয়নীও নীরবে চলে আসে ঘরে। চুপ করে এসে বসে জানলার ধারে। মনের ওপর আলোর তরঙ্গ আর থামে না। আলোর বন্যা যেন ভেসে যায় মৃগনয়নী। ভরে যায়। এক দুয়ার বন্ধ হয়ে অন্য দুয়ার খুলে গেছে। স্তব্ধ হয়ে গেছে মৃগনয়নী। স্থির হয়ে গেছে। বাইরের অনুভূতিগুলো মরার সঙ্গে সঙ্গে ভেতরের কতকগুলো দৃষ্টি খুলে গেছে। এমনি করে ত' বহুকালই কাটতে পারে। এ আনন্দ বিচ্ছিন্ন নয়। এর জন্ম নেই। এখানে পৌঁছে যাওয়া আর নিজেকে ভাসিয়ে দেওয়া।

সংসারের হিসেবী সময়ের মাপে মৃগনয়নী বুঝি বা অকেজো হয়েই পড়ল। দিন যায়। রাত যায়। মৃগনয়নী প্রতিদিনের কাজ যেটুকু না করলে নয় সেটুকু করে বেশীর ভাগ সময় ডুবে থাকে কোন এক অতলে। চাল ডাল আর বাজারের খোঁজটা কমলির মা-ই নেয়। একটু বেশী বেলায় কমলির মা কাছাকাছি একটা বাজারে নিজেই যায়—গঙ্গা স্নান করে ফেরার সময়।

—বরং গঙ্গাস্নান করলে পার?

মৃগনয়নী বলে,—কি হবে?

—বা। একি কথা! দেহ মন শুদ্ধ হবে।

কমলির মা অন্য কথা পাড়ে।—টাকা ফুরিয়ে গেলে কি করবে বলোত'?

—ভাবিনি কিছু।

—না খেয়ে মরবে? তার চেয়ে বরং ভাসুরের ওখানে—।

এ কথার উত্তর দেয় না মৃগনয়নী। কমলির মা ওর বাজারের পয়সা নিয়ে গঙ্গার দিকে চলে যায়।

এমনি করে আর কদিন কাটবে? কাটেও না। মাসখানেকের ভেতরেই কমলির মায়ের দিন টেনে টেনে চালায়।

চোখে পড়ে মৃগনয়নীর চাল ডাল কিছুই নেই। কমলির মায়ের হয়েছে জ্বালা। ও নিজে দুচার মৃগনয়নী তাকায় ওর দিকে,—কি করব বলোত'?

—এখানে ওখানে যাও। গিয়ে টাকা মেগে আন।

চুপ করেই থাকে মৃগনয়নী।

—দেখি, একটা কিছু করব।—মুখে বলে মৃগনয়নী।

নিজের জন্যে ভাবতে আর কিছুতেই ইচ্ছে হয় না। ও ভাবনার শেষ করে দিতে চায়। অনেক ভাবনা ভেবেও তার পরিণাম দেখেছে ও। আর ভাবনা নয়। তোমার ইচ্ছার স্রোতে নিজেকে ভাসিয়ে দিয়েছ। আর ভাবিও না আমায়। আর ভাবিও না। সারাটা রাত শুধু এই একটি প্রার্থনাই করে মৃগনয়নী,—আর ভাবিও না আমায়। ভাবনাই সংসার। ভাবনা আর চাই না। আমাকে শান্ত করো। আমায় আলোয় ভরা সংসারে সব খুইয়ে এই সম্পদটুকু দিলে, তাও কি কেড়ে নিতে চাও? মৃগনয়নী ডুবে যায়। ভরে যায় আবার। তোমার করুণার শেষ

নেই। আজীবন যা কিছু গেছে সে তোমার করুণা, যা পেলাম সেও তোমারই করুণা। করুণাময়। এবার নিজেকে তোমার বেদীতে বসিয়ে দাও। আর নামিও না। জলের ধারা নামে চোখে। ধুয়ে যায় সব কালো, সব—মালিন্য। যা নিলে তার চেয়ে দিলে অনেক বেশী। এত আলো দিলে, এমন করে পূর্ণ করে দিলে। যা গেছে, সেটা যে কত তুচ্ছ ভেবে অবাক লাগে। গেলই বা কোথায়। যা গেল তা অমৃতের রূপ নিয়ে ফিরে এল। কিছুই ত' খোয়া গেল না। আনন্দে কেঁপে কেঁপে ওঠে মৃগনয়নী। গভীর রাত্রে রোমাঞ্চিত হয়। চোখের জলের যেন আর শেষ নেই।

দুটো দিন কাটে। কমলির মা আর তার এদিকে আসে না। কি-ই বা করবে এসে এলেই ত' ঠেকে পড়বে। দিতে হবে নিদেন দুটিখানি চাল। কাঁহাতক আর পারা যায়। আচ্ছা ঝামেলার মেয়েমানুষ যা হোক, চোখ উলটে বসেই আছে। তবু নিজে খাবার সময় আজ আর না গিয়ে পারল না কমলির মা। দেখে ভাত নেই। ঘুম নেই। মরে গেল নাকি। একথালা ভাত বেড়ে নিয়ে কমলির মা এগোতে যাবে—এর ভেতর ডাক শোনে চিঠি। মৃগনয়নীর নামে চিঠি। চিঠি কি আর পড়তে জানে ছাই। বাছা চিঠিখানা খুলে তুমি পড়ে দাও। কি লিখেছে? পুলিশ থেকে? ওকেও পাকড়াও করবে নাকি? এ্যাঁ? টাকা। ও তিরিশ টাকা করে পাবে। মাসোহারা? পুলিশ থেকে? বলো কি? খোলা চিঠিখানা নিয়ে প্রায় ছুটতে ছুটতে ওপরে চলে আসে কমলির মা।

ওগো ও দিদি! দিদি কোথা গো!

আঁচল পেতে মেজের ওপর পড়েছিল মৃগনয়নী

—ওগো চিঠি এয়েছে!

মৃগনয়নী তাকায়। চোখদুটো ওর রাঙা

—পুলিশ থেকে তিরিশ টাকা করে মাসোহারা দেবে তোমায়।

মৃগনয়নী তাকিয়েই থাকে।

—কথা বলছ না কেন? কি হোল? টাকা আনতে কাকে পাঠাবে বলো? ভগবান রক্ষে করেছে। জয় বাবা বোম কালী! কপালে হাত ঠেকায় কমলির মা। মৃগনয়নী চোখদুটো নামিয়ে নেয় নীরবে। গায়ে হাত দেয় কমলির মা,—ওমা, একি! এত জ্বর! মৃগনয়নীর গা পুড়ে যাচ্ছে জ্বরে। একটু কথা বলতে যেতেই কাশি আসে মৃগনয়নীর। বুকের ভেতরটা যেন ব্যথা-বেদনায় মোচড়াতে থাকে।

—ওমা একি ছিষ্টিছাড়া মানুষ! আমাকে একবার ডাকোনি? এখুণী যাই।

কমলির মা চিঠিটা হাতে নিয়েই চলে যায় ডাক্তারের বৌ বীণার কাছে। কিছুক্ষণ পর ডাক্তারবাবু আসেন কমলির মায়ের সঙ্গে। বেলা তখন গড়িয়ে এসেছে। মৃগনয়নীর সর্বাঙ্গে আগুন, ভেতরে শান্ত আনন্দের জোয়ার। অনেক পেলাম আনন্দময়! আর কিছুই চাই না। চাওয়ার পালা শেষ হোল এ জন্মের মত। এ জন্মের স্বপ্ন ভেঙে গেছে। আর নয়। আর চাই না। মৃগনয়নীর রাঙা চোখের কস দুটো বেয়ে জল গড়িয়ে পড়ে। আর তপ্ত অশ্রু। ডাক্তারবাবু পরীক্ষা করে বলেন,—এখুনি হাসপাতালে পাঠাতে হবে। নইলে দুদিনও টিঁকবে না। কমলির মায়ের মুখ শুকিয়ে যায়। দিদি আর বাঁচবে না! কমলির মা হাতের উল্টা পিঠে চোখদুটো মুছে নেয়। ডাক্তার সব বোঝেন, আমিই সব ব্যবস্থা করছি। ফোন করে দিচ্ছি। গাড়ী এসে পড়বে এখুনী। চলে যান ডাক্তারবাবু। কমলির মা দাঁড়িয়ে থাকে চুপ করে। স্তব্ধ হয়ে।

হাতে সেই চিঠিখানা। মৃগনয়নীর ভেতরে কি ঠাণ্ডা। কি শান্ত শীতল ভাব সমুদ্র। আনন্দের ফুলারায় ভেসে বেড়াচ্ছে মৃগনয়নী বাইরের আলো যদি নিভে নিভুক। ভেতরের আলো নিভিও না। বিশ্বদেব। তুমি আলোয় ভরে দাও আমায়। আর কিছু চাইনে।

তিরিশ

তারপর? তারপর কি হোল? হাসপাতালে মৃগনয়নী। কয়েকটা দিন বেঁচে ছিল। এখানেই মৃগনয়নীর সঙ্গে আমার আলাপ। ওর কাহিনী শুনলাম। সেদিনটা ও বেশ ভালই ছিল। কত হাসল বলতে বলতে,—কত আশাই করেছিলাম। ওটেই মনকে বাঁধবার দড়ি কিনা। এতগুলো বছর যেন মস্ত একটা স্বপ্ন! স্বপ্নে যা গেল সেকি আর যাওয়া বাবা! তার চেয়ে কত বেশী যে পেয়েছি তোমাকে বোঝাতে পারব না। আলোয় ভরা চোখদুটো মেলে হাসল কতবার। তারপরদিনই মারা গেল মৃগনয়নী।

ভাবছি তাই বসে বসে কেনই বা মৃগনয়নীর কাহিনী শোনাতে বসলাম। বলেছিলাম ত' এ কোন মহারাণীর কাহিনী নয়। ভিখারিণীর কাহিনী। এক অতি সাধারণ মেয়ে মৃগনয়নী। তার কথা শোনাবার কিই দরকার ছিল।

হয়ত কিছুটা ছিল। জল কি বুঝতে হলে এক বিন্দু জল দেখলেই বোঝা যায়, সমুদ্র মাপবার দরকার হয় না। তেমনি বিশ্বজীবন প্রবাহের বিশালতাকে মাপতে চাওয়ার মত বোকামী আর নেই। একটি মাত্র জীবনেই অনন্ত জীবন প্রবাহের সত্যকে দেখতে পাওয়া যায়। অনন্ত কাল ধরে রূপ থেকে রূপান্তরে আসাযাওয়ার বিরাম নেই, তবু একটা জায়গায় জীবন অখণ্ড। একটা সুরে বাঁধা।

মৃগনয়নীর দেহটা যখন পুড়ছিল চিতায়। সেখানে আমি ছিলাম। জানিনে কমল জেলে বসে চোখের জল ফেলবে কিনা, কমল ফিরবে কিনা। কালো বৌ খবর পাবে কিনা। নতুন বৌয়ের মনটা এক মুহূর্তের জন্যেও ভিজে উঠবে কিনা। কে জানে? সে কথা থাক।

মৃগনয়নীর চিতার আগুন যেমন করে আকাশের দিকে উঠল, চিতার ধোঁয়া আকাশে গিয়ে মিশে গেল, তেমনি করে ওর জীবন কি ছড়িয়ে গেল বিশ্বজীবন চেতনায়? সে কথা যদি বলা হয়ে থাকে। তবে এখানেই ইতি।

সমাপ্ত

আ লো চ না

মেঘনাদ বধ-কাব্যে জীবনস্মৃতি

মেঘনাদবধ কাব্য পাঠ করিতে করিতে একটি কথা বারংবার পাঠকের মনে উদিত হয়—এ কাব্য কবির ব্যক্তিজীবনের আলেখ্য। এই মহাকাব্যের রাবণ চরিত্রের সহিত কাব্য স্রষ্টা মাইকেল মধুসূদনের চরিত্রের নানাদিক হইতে সাদৃশ্য আছে—আমরা প্রচলিত এই অর্থে কাব্যটিকে কবির ব্যক্তিজীবনের আলেখ্য বলিতেছি না। আবার যে উৎকৃষ্ট কবি-কল্পনা কবির বিশেষ জীবনবোধ, তথা জীবন দর্শনকে নির্বিশেষে মিলাইয়া দিতে পারে, ব্যক্তিজীবনের বিশেষ কথাটিকে বিশ্বমানবের অন্তরের বাণীতে পরিণত করিতে পারে, পার্থিব মানুষের রুদ্র-মধুর নিয়তিকে নিজ জীবনে প্রত্যক্ষ করিয়া তাহাকে বিশ্ব-নিয়তির সহিত একসূত্রে গাঁথিয়া দিতে পারে,—আমরা এখানে তাহার কথাও বলিতেছি না। এ কাব্যে তাহার পরিচয় তো আছেই; তাহা ব্যতীত যাহা একান্ত ভাবে 'পার্শোনাল'—তাহার পরিচয়ও যেন কাব্যের নানা স্থানে ছড়াইয়া আছে।

মেঘনাদবধ কাব্যের বিষয়বস্তু কি! এই মহাকাব্যের প্রধান পাত্র-পাত্রী কে?—প্রশ্ন দুইটির উত্তরে বলা যায়—এই কাব্য একটি বীরপুত্র ও তাহার ভাগ্যবিড়ম্বিত জনকজননীর করুণ কাহিনী। পিতা, মাতা ও পুত্র—ইঁহারাই হইতেছেন এই মহাকাব্যের মুখ্য চরিত্র।

মেঘনাদবধ রচয়িতার জীবন-কাহিনীও প্রথমদিকে প্রায় অনুরূপ। সেখানেও পিতা, মাতা ও পুত্রের কাহিনীই করুণরসে বেদনার্দ্র হইয়া আছে।

এই প্রসঙ্গে যে কথাটি প্রথমে মনে রাখা প্রয়োজন, তাহা হইতেছে এই যে কবি নিজ জীবনের অপেক্ষাকৃত শ্রেষ্ঠ সময়ে, যখন তিনি খ্যাতি ও প্রতিপত্তির উচ্চ শিখরে আসীন, তখনই এই মহা ট্র্যাজেডি রচনা করিয়াছিলেন। আপাতঃদৃষ্টিতে ইহা বিসদৃশ মনে হইলেও, বস্তুতঃ ইহাই হওয়া স্বাভাবিক ছিল। নিজ কৈশোর ও যৌবনের গভীর ট্র্যাজেডি কবি-চিত্তকে বিমথিত করিয়া তাঁহার আত্মার গভীরে যে অন্তর্মুঢ় ক্রন্দনের উৎস খুলিয়া দিয়াছিল, তাহারই ফল্গুধারা এই সৌভাগ্যের কালেও তাঁহার অন্তরের অন্তস্তলে নিয়ত প্রবাহিত হইতেছিল। তিনি কিছুতেই ভুলিতে পারিতেছিলেন না তাঁহার জীবন কাব্যের কথা—যে কাব্যের মেঘনাদ তিনি স্বয়ং এবং যাহার রাবণ ও মন্দোদরী হইতেছেন—দত্তকুলোদ্ভব রাজনারায়ণ ও জাহ্নবী দাসী।

এক অর্থে মেঘনাদবধ রচনার পূর্বেই মেঘনাদবধ হইয়া গিয়াছিল। মাইকেলের মেঘনাদবধ কাব্য যেন সেই পূর্বকাহিনীর Post-script মাত্র।

মেঘনাদ সেনাপতি-পদে অভিষিক্ত হইয়াছেন, লংকাপুরী আশায় আনন্দে পরিপূর্ণ। বন্দিগণ গান ধরিয়াছে—

"উঠ গো শোক পরিহরি, সতি! কোদণ্ড টংকারে যার বৈজয়ন্তধামে
রক্ষঃ কুল রবি ওই উদয়-অচলে। পাণ্ডুবর্ণ আখণ্ডল।.....
প্রভাত হইল তব দুঃখবিভাবরী গুণি-গণ শ্রেষ্ঠ গুণী, বীরেন্দ্রকেশরী
ওঠ, রাণি, দেখ, ওই ভীমবামকরে কামিনীরঞ্জনরূপে, দেখ মেঘনাদে।

দত্তকুলের বহু সন্তান নষ্ট হইয়াছে। দুঃখে ও শোকে রাজনারায়ণ এবং জাহ্নবী একান্তভাবে

কাতর। তাঁহাদের একমাত্র আশা ও সান্ত্বনা যে এক অলোকসামান্য প্রতিভা, পুত্ররূপে তাঁহাদের গৃহে আবির্ভূত হইয়াছেন। এই পুত্রই তাঁহাদের জীবনের যত দুঃখ, যত আর্তি, তাহার অবসান ঘটাইবে। "গুণি-গণ-শ্রেষ্ঠ-গুণী" পুত্রের অনুরাগে, সেবায় শ্রদ্ধায় ও কীর্তিতে বংশ পবিত্র ও জনক-জননী তৃপ্ত হইবেন—এই আশার বাণী মেঘনাদবধকাব্যের তথা কবির পারিবারিক জীবনের প্রথম সর্গে আকাশ-বাতাস ধ্বনিত ও প্রতিধ্বনিত করিয়া তুলিয়াছে। মেঘনাদবধকাব্য তথা কবির ও তাঁহার পিতামাতার জীবনেতিহাস এই আশাভঙ্গেরই এক অনবদ্য করুণকাহিনী।

আমাদের নিশ্চিত ধারণা যে মেঘনাদবধ রচনাকালে মধুসূদনের অবচেতন মনে নিজ পারিবারিক জীবনের, বিশেষতঃ তাঁহার জনকজননীর, এই বিশাল আশাভঙ্গের চিত্রটি সর্বদাই ঘুরিয়া ফিরিয়া বেড়াইত। এই বিষময় পরিণতির জন্য দায়ী কে—তাহা কবি বুঝিতে পারিতেন না। কোথাও, কাহারো ক্ষেত্রে যাহাকে Morallapse বলে, তাহার পরিচয় ছিল না। সকলেই নিজ নিজ ব্যক্তিগত ক্ষেত্রে নিজেকে ন্যায়ধর্মানুসারী বলিয়া মনে করিতেন। পিতৃ-কর্তৃক (Patriarchal) সমাজের আবহাওয়ায় জাত ও পরিপুষ্ট রাজনারায়ণ নিজ দিক হইতে সঙ্গতভাবেই ভাবতেন ও দাবী করিতেন যে জীবনের সর্বক্ষেত্রে পুত্র তাঁহার কর্তৃত্ব মানিয়া চলিবেন। আবার নূতন ব্যক্তিস্বাতন্ত্রের যুগের মানুষ মধুসূদনও সঙ্গতভাবেই দাবী করিতেন যে নিজ জীবনের ভাল মন্দ সিদ্ধান্ত করিবার অধিকার তাঁহারই আছে—অন্য কাহারো নাই। জননী জাহ্নবীর চিন্তা অন্য পথের। তিনি যুক্তি বুঝিতেন না। গভীর স্নেহ ও ব্যাকুল আর্তি কেন পুত্র বা স্বামীকে ব্যক্তিস্বাতন্ত্রের উত্তুঙ্গ কঠোরতা হইতে স্নেহ-প্রীতি-মমতার শীতল সমতলে নামাইয়া আনিবেনা তাহা এই হৃদয়সর্বস্ব নারী বুঝিয়া উঠিতে পারিতেন না। পিতা পুত্রের প্রতি পরম স্নেহশীল; পুত্র পিতামাতার প্রতি গভীর শ্রদ্ধাশীল ও অনুরক্ত; জাহ্নবী দাসীও প্রেমময়ী পত্নী এবং পুত্রপ্রাণা মাতা; তথাপি অঘটন ঘটিল। কেন ঘটিল—কেহ বুঝিল না। সকলেই ভাবিতে লাগিলেন—"কি পাপে হারানু আমি তোমা হেন ধনে?" "বাম বিধির", অপ্রতিরোধ্য "প্রাক্তনে"র নিষ্ঠুর লীলায় সকলেই ছিন্ন ভিন্ন হইলেন।

ঘটনার গতি অনুসরণ করিলে দেখা যায়, এই নিষ্ঠুর নিয়তির আত্মপ্রকাশ মধুসূদনের খৃষ্টধর্মগ্রহণে। যখন রাজনারায়ণ দত্তের পরিবারে সংবাদ পৌঁছিল যে খৃষ্টধর্মগ্রহণের অভিপ্রায়ে মধুসূদন ফোর্ট-উইলিয়াম দুর্গে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন—তখন রাজনারায়ণ সবলে পুত্রকে উদ্ধার করিবার উদ্দেশ্যে ফোর্ট উইলিয়াম আক্রমণ করিতে প্রস্তুত।

হেন কালে সভাতলে উতরিলা রাণী— আকুল কপোতী হায়! — — — —
মন্দোদরী, শিশুশূন্য নীড় হেরি যথা — — — রাজ পদে পড়িলা মহিষী।

আমরা কল্পনায় যেন প্রত্যক্ষ দেখিতে পাই,—পুত্রের আসন্ন ধর্মান্তর গ্রহণের সংবাদে উন্মাদিনী জননী জাহ্নবী প্রতিকারের প্রত্যাশায় তাঁহার রাজরূপ স্বামীর পদতলে পড়িয়া আছেন। পুত্রের নিদারুণ ব্যবহারে আহত ও বিধর্মী রাজশক্তির অন্যায় অত্যাচারে রোষে, ক্ষোভে অগ্নি-গর্ভ রাজনারায়ণ পরম অনুরাগে ও গভীর সমবেদনায় তাঁহার প্রিয়তমা জীবনসঙ্গিনীকে সমস্নে তুলিয়া ধরিয়া গভীর বিষাদে বলিয়া উঠিলেন—

"বাম এবে, রক্ষঃকুলেন্দ্রাণি, — — যাও ফিরে শূন্য ঘরে তুমি।
আমা দোঁহা প্রতি বিধি, হবে যে বাঁচিছে রণক্ষেত্র যাত্রী আমি, কেন রোধ মোরে!
এখনও, সে কেবল প্রতিবিধিৎসিতে— বিলাপের কাল, দেবি, চিরকাল পাব!

বৃথা রাজ্যসুখে, সতি, জলাঞ্জলি দিয়া, বন-সুশোভন শাল ভূপতিত আজি;
বিরলে বসিয়া দোঁহে স্মরিব তাহারে চূর্ণ তুঙ্গতম শৃঙ্গ গিরিবর শিরে;
অহরহঃ। — — — — গগনরতন শশী চির রাহুগ্রাসে।

কিন্তু এ চেষ্টা সফল হয় নাই। মধুসূদন ধর্মান্তর গ্রহণ করিয়াছেন। রাজনারায়ণ ও জাহ্নবী দাসীর চক্ষে তাঁহাদের "বীরবাহু মেঘনাদের" মৃত্যু ঘটিয়াছে। ভগ্নদূত এই সংবাদ বহন করিয়া আনিয়াছে। খিদিরপুরের দত্ত-ভবন গভীরতম বিষাদের অন্ধকারে নিমগ্ন; দত্তপুরীর পুষ্প শুষ্ক, দীপ নির্বাপিত, মুরজ, মুরলী, বীণা নীরব। রাজনারায়ণ দত্তের পরিবারে "সভাজন দুঃখী রাজদুঃখে।" আর কুলপতি স্বয়ং? মধুসূদনের বর্ণনা শুনুন—

রক্ষঃকুলপতি
বাকাহীন পুত্রশোকে; ঝরঝর ঝরে
অবিরল অশ্রুধারা—তিতিয়া বসনে।
যথা তরু, তীক্ষ্ণশর সরস শরীরে
বাজিলে কাঁদে নীরবে।

দূতের বার্তা বিশ্বাস করিতে—নিদারুণ সত্য বলিয়া নিশ্চিত জানিলেও—বিশ্বাস করিতে প্রবৃত্তি হয় না! "এ বারতা" যে "নিশার স্বপন-সম"। তাঁহার সেই পুত্র, স্নেহে ও শ্রদ্ধায়, শক্তিতে ও প্রতিভায় যে অসামান্য, সে সাধারণ মানুষের মত এই সর্বধ্বংসী অবিমৃষ্যকারিতার পরিচয় দিবে। "ফুলদল দিয়া কাটিলা কি বিধাতা শাল্মলীতরুবরে?" কিন্তু, হায়! "প্রাক্তনের গতিরোধে হেন সাধ্য কার?"

কিন্তু কোথা হইতে মৃদু রোদন-নিনাদ ভাসিয়া আসিতেছে! কাহার চরণের নূপুরধ্বনি যেন শ্রুত হইতেছে! রাজনারায়ণের কক্ষে কে প্রবেশ করিল! জননী জাহ্নবী!

"আলু থালু, হায়, এবে কবরীবন্ধন! পূর্ণ পদ্মপর্ণ যেন! বীরবাহু শোকে
আভরণহীন দেহ, হিমানীতে যথা বিবশা রাজমহিষী, বিহঙ্গিনী যথা,
কুসুমরতনহীন বন-সুশোভিনী যবে গ্রাসে কাল-ফণী কুলায়ে পশিয়া
লতা! অশ্রুময় আঁখি, নিশার শিশির- শাবকে।

মধুস্বরে জাহ্নবী দাসী বলিলেন—

একটি রতন মোরে দিয়াছিল বিধি লংকানাথ? কোথা মম অমূল্য রতন?
কৃপাময়; দীন আমি থুয়েছিনু তারে দরিদ্র ধন রক্ষণ রাজধর্ম; তুমি
রক্ষাহেতু তব কাছে, রক্ষঃকুলমণি, রাজকুলেশ্বর, কহ, কেমনে রেখেছ,
তরুর কোটরে রাখে শাবকে যেমতি কাঙ্গালিনী আমি, রাজা, আমার সে ধনে?
পাখী, কহ, কোথা তুমি রেখেছ তাহারে * * * * * *

এই সকরুণ উক্তির ছত্রে ছত্রে যে মর্মভেদী অভিমান, যে সুতীক্ষ্ণ অনুযোগ, ব্যক্তিজীবনের যে চিত্তদাহী দুর্ভাগ্য ফুটিয়া উঠিয়াছে তাহা সঙ্গে সঙ্গে মনকে অভিভূত করে। বহুদুঃখে বিদগ্ধ জাহ্নবী দাসী কৃপাময় দেবতার অনুগ্রহে রত্নসদৃশ পুত্রলাভ করিয়াছিলেন, তাহাকে যথাপথে চালিত করিয়া সার্থকতায় মণ্ডিত করিবার গুরুতম দায়িত্বভার যথাযথভাবে বহন করিতে না পারায় যে সুভীষণ পরিণতির সৃষ্টি হইল—মহারাণী চিত্তাঙ্গদার এই মর্মভেদী বিলাপে তাহার সকরুণ চিত্রটিই পরম বেদনাময় রসরূপ লাভ করিয়াছে।

মধুসূদন খৃষ্টান হইয়াছেন। রাজনারায়ণ দত্তের মনোনীত পাত্রীকে তিনি ধর্মপত্নীরূপে গ্রহণ করেন নাই। জনকজননীর সহিত পুত্রের সামাজিক ও ধর্মীয় সম্পর্ক ছিন্ন হইয়াছে। বিসপ্‌স্ কলেজে পড়িতে পড়িতে সকলের অজ্ঞাতসারে মধুসূদন অনির্দেশের পথে যাত্রা করিয়াছেন। মাতা-পিতার বড় আদরের, বড় আশার ধন সামাজিক ভাবে মৃত ও অজ্ঞাতবাসের জন্য বাস্তবজীবনেও মৃতপ্রায়, সংসার সাজাইবার, পুত্র-পুত্রবধূ লইয়া পরমানন্দে দিনাতিপাত করিবার এবং শেষ বিদায়ের পূর্বে এত কষ্টে, এত যত্নে গঠিত সংসারের সম্পূর্ণভার তাহাদের উপর ন্যস্ত করিয়া চিরবিশ্রাম গ্রহণের যে সাধছিল, যে স্বপ্ন রাজনারায়ণ দেখিয়াছিলেন তাহা চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়াছে। মেঘনাদবধ কাব্যের শেষ সর্গে যে "বিশদবস্ত্র বিশদউত্তরী" রাবণকে আমরা দেখি, তাহা এই শোকাভিভূত ও ভগ্ন হৃদয় রাজনারায়ণেরই চিত্র। তাঁহারই মর্মমূল নিদারুণ বেদনায় বিমর্থিত করিয়া যে সর্বনাশের হাহাকার ধ্বনি উঠিয়াছিল, তাহারই বাণীরূপ শোকদীর্ণ রাবণের নিম্নোদ্ধৃত ভাষণে প্রতিধ্বনিত হইয়া চিরন্তন হইয়া রহিয়াছে :—

"ছিল আশা, মেঘনাদ, মুদিব অন্তিমে,
এ নয়নদ্বয় আমি তোমার সম্মুখে;—
সঁপি রাজ্যভার, পুত্র, তোমায়, করিব
মহাযাত্রা! কিন্তু কিন্তু, বিধি,—বুঝিব কেমনে
তাঁর লীলা? ভাঁড়াইলা সে সুখে আমারে!
ছিল আশা, রক্ষঃকুল রাজসিংহাসনে
জুড়াইব আঁখি, বৎস, দেখিয়া তোমারে
বামে রক্ষঃকুললক্ষ্মী রক্ষোরাণীরূপে
পুত্রবধূ! বৃথা আশা! পূর্বজন্মফলে
* * * *
* * * *
কর্বুর গৌরবরবি চির রাহুগ্রাসে।

রাবণের শোকে লংকাপুরী "সপ্তদিবানিশি" কাঁদিয়াছিল। রাজনারায়ণ ও জাহ্নবী দাসীর দুঃখে বাঙ্গালী চিরকালই কাঁদিবে।

বিমলাকান্ত মুখোপাধ্যায়

বাঙলা প্রেম-কবিতার প্রথম পর্যায়

আধুনিক বাঙলাসাহিত্যে উৎকৃষ্ট প্রেম-কবিতার প্রাচুর্য আমাদের বিস্মিত করে। এই প্রেম-কবিতার ধারা আলোচনা করতে হলে আমাদের অতীতে ফিরে যেতে হবে—বাঙলা প্রেমকবিতার প্রথম পর্যায়ে পদচারণা করতে হবে। আজকের উৎকর্ষের পেছনে রয়েছে যুগান্তের ইতিহাস, যাকে কোনক্রমেই অস্বীকার করা চলে না।

প্রেম মানবমনের শাশ্বত, চিরন্তন অনুভূতি। কাব্যে প্রেমের প্রকাশ অব্যম্ভাবী। প্রেমাবেগাপ্লুত হৃদয় কাব্যকে অন্যতম শ্রেষ্ঠ বাহন হিসাবে স্বীকৃতি দেয়। সর্বকালের সর্বদেশের সাহিত্যেই সূচনাকাল থেকে প্রেমের একটি নির্দিষ্ট উচ্চস্থান আছে। বাঙলা সাহিত্যেও এর ব্যতিক্রম নয়।

বাঙলা সাহিত্যের প্রেম-কবিতার আলোচনায় 'প্রাকৃত পৈঙ্গল' এবং 'গীতগোবিন্দের' উল্লেখ অবশ্য প্রয়োজনীয়। ভাষায় আধুনিক বাঙলার সঙ্গে যোগ না থাকলেও, ভাবে, ছন্দে বক্তব্যের আন্তরিকতায়, বাঙলা সাহিত্যের সঙ্গে উক্ত গ্রন্থদ্বয়ের যোগ সুপরিচিত।

প্রাকৃতপৈঙ্গল থেকে একটি নিদর্শন নেওয়া যাক—

'সো মহ কন্তা পাউস আঅ
দূর দিগন্তা চেউ চলাঅ।'

সেই আমার কান্ত, এখন দূর দিগন্তে; বর্ষাকাল এসে গেল, চিত্ত আমার চঞ্চল হয়ে উঠেছে। একটি উৎকৃষ্ট প্রেম-কবিতা।

জয়দেবের গীতগোবিন্দ প্রেম-কাব্যের একটি উজ্জ্বল নিদর্শন। কিন্তু কবি এখানে 'হরি'র উল্লেখ করে প্রেম-কবিতাকে আধ্যাত্মিক আবরণ পরিয়ে উচ্চমার্গে প্রতিষ্ঠিত করে রেখেছেন। তবু প্রেম-কবিতার সূচনা হিসেবে জয়দেবের কাব্যকে স্মরণ করতে হয়।

অতঃপর আমরা পাই বৈষ্ণব-পদাবলী সাহিত্য। পঞ্চদশ শতকের শ্রেষ্ঠ পদকর্তা বিদ্যাপতি-চণ্ডীদাসের অজস্র পদে প্রেম নানারূপে নানাবর্ণে বিকশিত। চণ্ডীদাসের পদালোচনা করা যাক—

কানুর পিরীতি বলিতে বলিতে
পাঁজর ফাটিয়া ওঠে।
শঙ্খ-বণিকের করাত যেমতি
আসিতে যাইতে কাটে।

বা

কলঙ্কী বলিয়া ডাকে সব লোকে
তাহাতে নাহিক দুখ।
তোমারি লাগিয়া কলঙ্কের হার
গলায় পরিতে সুখ।

আধুনিক বাঙলা সাহিত্যের প্রেম-কবিতায়ও এমন আর্তি, আকুলতা, এমন নিবিড়তা সচরাচর পাওয়া যায় না। এই আত্মসমর্পণ, প্রেমের এই অসহনীয় জ্বালা, প্রেমাষ্পদের জন্যে সর্বস্বত্যাগের আকুলতা আধুনিক প্রেম-কাব্যে এর তুলনা মেলে না! কিন্তু কবি 'কানু' কথাটি ছাড়তে পারেন নি। কবি হৃদয় থেকে হৃদয়ে কথা বলতে পারেন নি। এখানেও আধ্যাত্মিকতার প্রলেপ পড়েছে। কবিতা ঈশ্বরমুখী হয়েছে। কারণ বৈষ্ণব কবি ব্যক্তিচেতনায় নয়, গোষ্ঠীচেতনায় বিশ্বাসী। বিদ্যাপতির কাব্যে প্রেমের চাঞ্চল্য, আবেগ, তীব্র আকুতি প্রকাশিত হয়েছে কিন্তু তাঁর কাব্যও গণ্ডীবদ্ধ।

'সখি, কি পুছসি অনুভব মোয়।
সোই পিরীতি অনুরাগ বখানিতে
তিলে তিলে নূতন হোয়।'

বিদ্যাপতির কাব্য বহু আলোচিত। বিদগ্ধমহলে, গবেষকসমাজে বিদ্যাপতির কাব্য সম্পর্কে নানা মতদ্বৈধতা। তিনি প্রচুর লৌকিক কবিতাও রচনা করেছেন। রাজা শিবসিংহের উল্লেখযুক্ত এমন একাধিক পদ আমরা পেয়েছি। 'লাখ লাখ যুগ হিয়ে হিয়ে রাখনু, তবু হিয় জুড়ন ন গেল', একে কি লৌকিক কবিতা বলবো না?

ষোড়শ শতকের শ্রেষ্ঠ পদকর্তা জ্ঞানদাস। রবীন্দ্রনাথ জ্ঞানদাসের অনুরাগী ছিলেন। জ্ঞানদাসের কাব্যপাঠে তিনি মুগ্ধ, বিস্মিত; নানা স্থানে সপ্রশংস উল্লেখও করেছেন। প্রেম কবি তার আলোচনায় জ্ঞানদাসকে স্মরণ করতেই হবে।

রূপের পাথারে আঁখি ডুবি সে রহিল।
যৌবনের বনে মন হারাইয়া গেল।'

আঁখি কোথায় ডুবে যায়? না, রূপের সমুদ্রে। মন হারায় যৌবনের অরণ্যে। এ অরণ্যে কবির মনও কি হারায় না? ষোড়শ শতকের কাব্যের আবেদন আজও অম্লান।

'রূপলাগি আঁখি ঝুরে, গুণে মন ভোর।
প্রতি অঙ্গ লাগি কাঁদে, প্রতি অঙ্গ মোর।'

এ আবেগ, এ অনুভূতি আধুনিক কাব্যকেও ম্লান করে দেয়।

'তোমার আমার একই পরাণ, হিয়ার হৈতে বাহিরে হৈয়া
ভাল সে জানিয়ে আমি। কেমনে আছিলে তুমি।'

পরবর্তীকালের লিরিক সুর পাই, এই কবিতায়। কিন্তু তবু আমরা লৌকিক প্রেম-কবিতার পর্যায়ে একে ফেলতে পারিনা। এই কবিতাও ঈশ্বরমুখী। কবি নিজের কথা বলতে পারেন নি, বলেছেন রাধার কথা, কৃষ্ণের কথা। কারণ সর্বোপরি জ্ঞানদাস বৈষ্ণবকবি। রবীন্দ্রনাথের ভাষায়—'তোমাপানে ধায় তার শেষ অর্থ-খানি'। সকল বৈষ্ণবকবিই এই গোষ্ঠীচেতনার নিগড়ে আবদ্ধ। কবিশেখরের রচনার একটি অংশ অনবদ্য।

'রহ রহ সখি, ভালো করিয়া দেখি,
আঁখি না পিছলে মোর।'—

এই চিত্রকল্প আধুনিক যুগেও বিরল। দেখা যাচ্ছে, বাঙলাসাহিত্যে প্রেম-কবিতার প্রাচুর্য, অথচ মানবিক প্রেম নয়, ঈশ্বরমুখ্য প্রেম। হৃদয়ের কথা বলতে গিয়ে কবিকে সংযত হতে হয়েছে। ফিরে যেতে হয়েছে বিধিবদ্ধ সীমার মাঝে। একই আবর্তে আমরা অহরহ প্রদক্ষিণ করেছি, মুক্ত হতে পারিনি।

প্রথম মুক্ত হতে পারলাম, ১৫৭৬ খৃষ্টাব্দের পর। বাঙলার ইতিহাসে, তথা সাহিত্যের ইতিহাসে ১৫৭৬ খৃষ্টাব্দ বিভিন্ন কারণে স্মরণীয়। এই সময় মোঘল-বিজয় হয়। প্রাদেশিক স্বাধীনতা লোপ পেল। কেন্দ্রীয়ভাবে বাঙলাদেশ শাসিত হতে লাগলো। দিল্লী, আগ্রা, অর্থাৎ উত্তর ভারতের সঙ্গে বাঙলার স্থায়ী যোগাযোগ ঘটল। ফলে উত্তর ভারতের হিন্দী-ফরাসী রোমান্টিক সাহিত্য বাঙলায় প্রবেশলাভ করল। ফারসী ভাষা ও ফারসী রীতির প্রভাব পড়ল আমাদের সাহিত্যে। হিন্দু-মুসলমানের যৌথ-সাংস্কৃতিক প্রচেষ্টায় সাহিত্য উন্নতির পথে অগ্রসর হল।

অনেকে মনে করেন, মুসলমান কবিরাই সর্বপ্রথম মানবিক প্রেমের কবিতা রচনা করেন। প্রচলিত বিধিকে এরা অনায়াসেই অতিক্রম করতে পেরেছেন।

সপ্তদশ শতকে আরাকান রাজসভায় বাঙলা সাহিত্যের দুজন বড় কবির সাক্ষাৎ পাই। এঁরা প্রণয়কাব্য রচনায় যথেষ্ট নৈপুণ্যের পরিচয় দিয়েছেন। 'বিদ্যাসুন্দরকে' প্রণয়কাব্য বলা চলতে পারে। পরবর্তীকালে যদিও ধর্মীয় আবরণে এই কাব্যকে অন্যরূপ দেবার প্রচেষ্টা হয়েছে। লৌকিক প্রেম-কাহিনীর প্রথম কবি হিসেবে দৌলত কাজীকেই মেনে নিতে হয়। দৌলত কাজীর কাব্যের নাম 'সতীময়না' বা 'লোরচন্দ্রাণী'। কাব্যগ্রন্থ তিনি সমাপ্ত করতে পারেন নি। পরবর্তী কবি আলাওল শেষাংশ রচনা করেন।

গোহারী দেশের রাজা লোরের সঙ্গে সুন্দরী রাজকন্যা ময়নামতীর বিবাহ হয়েছে। ইতিমধ্যে এক যোগী এসে রাজাকে চন্দ্রাণীর চিত্র দেখায় ও প্রলুব্ধ করে। চন্দ্রাণী পরস্ত্রী। তার স্বামী বামন ও নপুংষক। লোর চন্দ্রাণীকে লাভ করবার আশায় সেই দেশে গেল। সেখানে তাদের মিলন ও প্রণয় হয়। কিন্তু অজস্র বাধা। অতএব পলায়ন। বামন তাদের অনুসরণ করে। যুদ্ধ হয়। বামন নিহত হয়। লোরের সঙ্গে চন্দ্রাণীর বিবাহ হয় এবং লোর সেখানেই বাস করতে থাকে।

এদিকে ময়নার দিন কাটে বিরহ-যন্ত্রণায়। 'তিলেক বিচ্ছেদ হইলে দোহান আকুল', এমনি নিবিড় ছিল তাদের প্রেম। স্বামীর মঙ্গলের জন্যে ময়না শিবদুর্গার আরাধনা করে। এদিকে এক রাজপুত্র তার রূপে আকৃষ্ট হয়ে দূতী প্রেরণ করে। ময়না দূতীকে অপমান করে। এবার ময়না এক ব্রাহ্মণের হাতে শুকপক্ষী দিয়ে লোরের কাছে পাঠায়। লোর পূর্বকথা স্মরণ করে। পুত্রের হাতে রাজ্যভার দিয়ে চন্দ্রাণীকে নিয়ে ময়নার কাছে আসে। দৌলত কাজী এই পর্যন্ত রচনা করে যান। এই কাহিনী বিশুদ্ধ মানবিক কাহিনী। কোন ধর্মীয় অনুশাসনকে মানেন নি কবি। কোন আধ্যাত্মিক প্রলেপ দেন নি কাহিনীতে।

রোসাঙ্গ রাজসভার অন্যতর শ্রেষ্ঠ কবি আলাওল। তিনি একাধিক গ্রন্থ প্রণয়ন করেছেন। এঁর প্রথম ও শ্রেষ্ঠ রচনা 'পদ্মাবতী পাঁচালী'। জয়সীর পদ্মাবতী কাব্যকে তিনি অনুসরণ করেছেন, কখনো বা মৌলিক রচনাও যোগ করেছেন। কাব্যটি নিছক অনুবাদ নয়। আলাওল সুফী সাধক ছিলেন। সুফী প্রেম-সাধনা সম্বন্ধে গভীর ও রসগর্ভ মৌলিক উক্তি করেছেন স্থানে স্থানে। কিন্তু মানবিক প্রেমই আলাওলের কাব্যে প্রাধান্য পেয়েছে। কাহিনীচয়নে, রচনায়, সর্ববিষয়ে তিনি মানবিক প্রেমকে উচ্চস্থান দিয়েছেন। উৎসাহী পাঠক তাঁর কাব্যপাঠে এ উক্তির যাথার্থ্য অনুধাবন করতে পারবেন। প্রেমকে আলাওল কি ভাবে দেখেছেন—

"প্রেম বিনে ভাব নাহি ভাব বিনে রস যাঁর হৃদে জন্মিলেক প্রেমের অঙ্কুর
ত্রিভুবনে যত দেখ প্রেমহস্তে বশ। মুক্তিপদ পাইল সে সবার ঠাকুর।"

বাঙলা প্রেম-কবিতার প্রথম পর্যায় আলোচনায়, আলাওলকেই পথিকৃৎ হিসেবে মেনে নিয়ে আমাদের অগ্রসর হতে হবে।

হরেন ঘোষ

লঘিষ্ঠ

ঢিল বা পাটকেল ইঁটের উত্তরপুরুষ। কাঁচের ঘরে বাস করে লোকে অন্যকে ঢিলমারা বুদ্ধিমত্তার অপরিচায়ক বলে মনে করে এমন কি কোঠাবাড়ীতে বাস করলেও পাটকেল খাবার আশংকায় মানুষ ঢিল ছোঁড়া থেকে বিরত থাকে। তাই ইষ্টক হাজার দরুণে কেনাবেচা করলেও ইষ্টকখণ্ডকে কেউ তুচ্ছ করে না। এটা গোড়ায় বলে রাখার কারণ লঘিষ্ঠ কথাটির সঙ্গে ইষ্টকখণ্ডের উচ্চারণ বৈষম্যে কতকটা সাদৃশ্য দেখা গেলেও উভয়ের মধ্যে কিছুমাত্র সম্পর্ক নেই।

জনমং দুঃখকারণাৎ—দুঃখরূপ কারণ থেকে জীবের জন্ম। জীবনভোর মানুষের শাস্ত্রানুসারে ত্রিবিধ এবং বাস্তবিক পক্ষে বহুবিধ দুঃখের অন্ত নেই। আনন্দ মানুষের অন্বেষণের বিষয় তাই সে দুঃখনিবৃত্তি বা কষ্টলাঘবের চেষ্টায় ফেরে। লঘু বিষয়কে যাঁরা গুরুত্ব দিতে পরাঙ্মুখ তাঁদের একথা স্মর্তব্য যে লাঘব শব্দটি লঘু থেকে ব্যুৎপন্ন। অতএব জীবনের মুখ্য উদ্দেশ্য যে দুঃখলাঘব তা লঘুর কাছে ঋণী; শুধু ব্যুৎপত্তিগত ভাবেই নয় প্রকৃতপক্ষেও।

বিরাট এবং ভারী বস্তুর প্রতি মানুষের সম্ভ্রমসূচক মনোভাব আছে আর আছে গুরুতর বিষয়কে গুরুত্ব দেবার প্রবণতা। সে সম্ভ্রমে দূরত্ব আছে—ভীতির সঙ্গে মস্তিষ্কের ব্যবধান

বজায় রাখা আছে, নেই শুধু হার্দ্য নৈকট্য আর নেই অন্তরের যোগ।

ব্যক্তিত্বের দ্যোতনায় গাম্ভীর্য অনাত্ম কিন্তু যখন তা স্বভাবকে পেয়ে বসে তখন রাম-গরুড়ের ছানা আখ্যা পায়। চেষ্টারফিল্ড লর্ড ছিলেন। তাঁদের কোটের আস্তিনের মধ্যে থেকে রুমালখানা বের করার মধ্যেও কেতা ছিল এবং সেই সব কেতায় দুরন্ত হতে পারা তাঁদের প্রভুত্বের যোগ্যতা সূচিত করত।। তিনি তাঁর ছেলেকে অনেক চিঠি লিখতেন; সে সব চিঠিতে আদব কায়দা শেখাতেন। একবার লিখেছিলেন ঃ উচ্চৈস্বরে হাসাটা বদভ্যাস। সেটা বিশদ বোঝাতে গিয়ে ছেলেকে লিখছেন—'আমার জ্ঞানবৃদ্ধি হবার পর থেকে আমি কখন চেঁচিয়ে হেসেছি কিনা মনে পড়ে না, যত হাসির কারণ ঘটুক আমি মুচকি হেসেছি—সে হাসিতে কখন শব্দ হয় নি; তা বলে আমার যে রসবোধ নেই তা নয় অনেকের চেয়েই রসবোধ আমার বেশী।

ভাল কথা। কিন্তু হাসিটা যদি সরবই হয় তাতে ক্ষতি কি? তাতে কি রসবোধ কম থাকা বোঝায়! হাসাটা মুখ্য—আওয়াজটা নয়, তবু হাসিতে যদি শব্দ ওঠে তাকে দমন করার প্রচেষ্টার মধ্যে কী বা এমন সার্থকতা আছে বোঝা শক্ত। মেপে কথা বলা বা মেপে হাসা ও গায়ের মাপে জামা বা পায়ের মাপে জুতো নয় স্থান কাল পাত্র এবং বিষয় সাপেক্ষে তাদের মাপ। অনুপাত জ্ঞান থাকলে সে পরিমিতিবোধের অভাব ত কখন ঘটে না।

কিন্তু ব্যাপারটা হচ্ছে অন্য—গুরু গম্ভীর হবার বাসনায় লঘুতার ঊর্ধ্বে ওঠার চেষ্টা। এই চেষ্টার ফলে কতকগুলো অমূলক ধারণার পোষকতা। তাই রসিকতাকে ছ্যাবলামি, পরিহাসকে বিদ্রূপ, সরসতাকে চাপলা এবং এ সব কিছুকেই অশ্লীল মনে করা এক শ্রেণীর গাম্ভীর্য-সাধকের শুচিবাই। নিয়মের রাজত্বে শোনা যায় গুরুদ্রব্য নিম্নগামী এবং লঘু দ্রব্য ঊর্ধ্বগামী। সেটা মনে রাখলে বোঝা যাবে লঘুতার ঊর্ধ্বে ওঠার প্রয়াসে আয়াস আছে।

প্রবন্ধপাঠকের সংখ্যা বাঙালী পাঠক সমাজে বড় অল্প। হেতু প্রবন্ধ নামটি। মহা-মহোপাধ্যায় অমূক ন্যায়তীর্থ বেদান্তশাস্ত্রী এই নামটির সঙ্গে প্রবন্ধ এই নামটিকে পাঠকবৃন্দ একই দৃষ্টিতে দেখতে অভ্যস্ত। যে অভ্যাস গড়ে উঠেছে পাঠ্যপুস্তকে সন্নিবিষ্ট কাজের কথার প্রবন্ধ দেখে দেখে। বিদ্যালয়পাঠ্য পুস্তকের কথা এবং শিক্ষক মহাশয়ের কথায় কোন পার্থক্য নেই এবং বলা বাহুল্য দুটিই ছাত্রের পক্ষে পরম উপকারী হলেও পরম প্রীতিপ্রদ নয়। সেই অপ্রীতিতে ইন্ধন যোগায় ছাত্রোত্তর জীবনে দৃষ্ট সাময়িক পত্রাদিতে প্রকাশিত পাণ্ডিত্যপূর্ণ জ্ঞানগর্ভ প্রবন্ধগুলি। পাণ্ডিত্যপূর্ণ গবেষণার প্রয়োজন আছে তা প্রকাশের প্রয়োজনীয়তা স্বীকার্য কিন্তু সাধারণ পাঠকের কাছে—যিনি সাহিত্যপত্রিকা পাঠেচ্ছু—তা স্বাভাবিক কারণেই অমনোমত। পণ্ডিতমাত্রেই লেখক নন। আর সাহিত্যগুণান্বিত নয় এমন লেখা পড়ে মানুষ আনন্দ পায় না। আর মানুষ কাজের কথার চেয়ে বাজেকথায় আনন্দ বেশী পায়। তাই বাজে কথার পরতে পরতে কাজের কথা মিশিয়ে দেওয়া যাঁর সাধ্য তিনিই সার্থক প্রবন্ধকার। ম্যালেরিয়ায় কুইনিন অমোঘ জানা সত্ত্বেও রোগীর সে তিক্তবটিকা গ্রহণে অরুচি লক্ষ্য করে শর্করা-মণ্ডিত তিক্তবটিকার প্রচলন হয়।

পাঠকসম্প্রদায়কে গণ্য করলে—সার্থকতার জন্য সবচেয়ে বেশী প্রয়োজনীয় তাই প্রবন্ধ-লেখার চালটি। বলা বাহুল্য যেটি লঘু চাল (যা সুপাচ্যও বটে)। লঘু প্রবন্ধ নামে একটি বস্তু বাঙলা সাহিত্যে অল্প হলেও আছে যার আর একটু নাম বদলে আধুনিককীকরণ হয়েছে রম্য-রচনা। রচনাটি সে যে বিষয়েই হোক রমনীয় হওয়া বাস্তবিক বাঞ্ছনীয়। কী বলা হচ্ছে খুব

দরকারী কিন্তু কেমনভাবে বলা হচ্ছে তাও দরকারী এবং মনে হয় বেশী দরকারী। পড়তে ভাল লাগার দাবী পাঠকমাত্রেই করতে অধিকারী। লেখকের সে দাবীকে শ্রদ্ধা জানান উচিত—প্রবন্ধ-কারের সে দায়িত্ব স্বীকার করা কর্তব্য। বিস্তর গবেষণা করা হয়েছে প্রাবন্ধিকের এ আত্মপ্রসাদ পাঠককে খুসী করে না।

প্রমথ চৌধুরীর যে কোন প্রবন্ধ বলার ভঙ্গী এবং সরস চালের গুণে হৃদয় সংবেদ্য। তিনি অনেক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে বহু সুচিন্তিত প্রবন্ধ রচনা করেছেন কিন্তু প্রতিটি প্রবন্ধই প্রথমত পড়তে ভাল লাগে। রমনীয়তা তার রচনার প্রথম গুণ। এই ভাল লাগার মূল্য কম নয়। এর জন্যে দুটো অপ্রয়োজনীয় কথা দুটো রসিকতা কোনঅপরাধ নয় আর তাতে প্রবন্ধের জাতিচ্যুতি ঘটে না। এ কথা বলার উভয় তরফ থেকে উদ্দেশ্য আছে। লেখকের তরফ থেকে পাঠকের কথাটা ভাবা দরকার তাঁর বিষয়বস্তুর পাঠক হিসেবে ছাত্র হিসেবে নয়। আর পাঠকের জানা দরকার প্রবন্ধ পাঠে আগ্রহ অন্তর্হিত হবার কোন কারণ নেই কেন না প্রবন্ধমাত্রেই দুষ্পাঠ্য নয়, সুপাঠ্য এমন কি সুখপাঠ্য প্রবন্ধও আছে যা 'বুঝে কেমন লাগল' আসবে পরে, আগে 'পড়ে ভাল লাগল'।

একজন খ্যাতনামা প্রবন্ধকার তাঁর রচনার বিষয়বস্তু সম্পর্কে বলতে গিয়ে বলেছেন সব বিষয়, যে কোন বিষয়, সামান্য কোন বিষয় অথবা কোন বিষয় নিয়েই নয়—তাঁর রচনা রূপ পেতে পারে। কোন বিষয় নেই অথচ সেটি প্রবন্ধ হওয়া সম্ভব কেমনভাবে বলা হয়েছে তার উপর। তেমনি অত্যন্ত লঘু বিষয়কে অত্যন্ত গুরুগম্ভীরভাবে বললে হৃদয় সংবেদ্য হতে পারে। গোঁফ নিয়ে একটা প্রবন্ধ যদি ভারতে প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন-এর প্রচলিত ছাঁদে লেখা হয় সেটা অতি সুপাঠ্য হতে পারে; যেমন পারে লঘুচালে লেখা সুচিন্তিত প্রবন্ধ।

পণ্ডিতের কথা থাক; লেখকের কারবার পাঠকের সঙ্গে (সাহিত্যিক এবং বৈষয়িক উভয়ার্থে)। শিক্ষক ছাত্র সম্পর্ক মহান হোক মধুর নয়। সংবিধান যখন কোনপ্রকার জাতিভেদের বিপক্ষে তখন পাঠক সম্প্রদায়ের মধ্যে সাধারণ পাঠক এবং প্রবন্ধপাঠক এ দুইজাতিতত্ত্ব প্রতিষ্ঠায় কোন সুফল নেই। পাঠক বলতে সব পাঠককে বুঝাতে হবে আর তা বুঝতে হবে প্রবন্ধ-লেখককেই। প্রবন্ধকার এবং প্রবন্ধপাঠক সাহিত্যের তীর্থক্ষেত্রে এমন তপশীলভুক্ত হওয়ার কারো কোন গৌরব নেই, ব্রাহ্মণ্যের অভিলাষী হলেও নয়। শরৎচন্দ্র একবার কোন রবীন্দ্রনিন্দুককে ধমক দিয়ে বলেছিলেন, 'আমি লিখি তোমাদের জন্যে আর উনি লেখেন আমাদের জন্যে।' কথাটা শরৎচন্দ্র বলেছিলেন রবীন্দ্রনাথের উদ্দেশে কাজেই ঐ শ্রদ্ধার উক্তি বেশ মানিয়ে গেছে কিন্তু রবীন্দ্রনাথ কখন সে ধারণাকে মনে স্থান দেন নি। তিনি কখন এমন কথা ভেবে উৎফুল্ল হতেন না যে তিনি মুষ্টিমেয় পাঠকের জন্য লেখেন; সে রকম ভ্রমাত্মক বিশ্বাস যদি তাঁর থাকত তবে তিনি বিশ্বকবি হতেন না,—তবে তিনি কবিগুরু হতেন না তাঁর বিশ্বাসের গুরুত্ব সত্ত্বেও।

লেখক পাঠকের সম্পর্ক যখন ইটপাটকেল ছুঁড়ে গড়ে ওঠার পরিবর্তে একমাত্র লেখার মাধ্যমেই গড়ে ওঠে তখন সে মাধ্যমকে মিলনের অনুকূল ক্ষেত্রে পরিণত করা প্রয়োজন। সে প্রয়োজনকে কার্যকর করতে গিয়ে যদি হাসবার সময় শব্দ হয় তবে সে হাসিটুকু রুমাল দিয়ে মুছে না ফেলাই ভাল। বাজে কথা মানেই বাজেকথা নয়। গল্প বলে ভাত খাওয়ালে পেট কিছু কম ভরে না, কথায় ভুলিয়ে ওষুধ খাওয়ালেও রোগ সারে। খেলাচ্ছলে লেখা প্রবন্ধে বিষয়বস্তু থাকতে পারে এমন কি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়বস্তু—গুরুভার না হয়েও। ভাবের তলায় চাপা পড়াকে

গভীরে ডুব দেওয়া বলে না। সাঁতার দিতে যে জানে ডুব দিতে সে জানবেই।

প্রমথনাথ বিশী মশায় তাঁর কমলাকান্তের এক আসরে মননধর্মী প্রবন্ধের বিষয় আলোচনা প্রসঙ্গে যা বলেছেন তার অংশবিশেষ আলোচ্য নিবন্ধের পরিপূরক বিধায় উদ্ধৃত করা যাচ্ছে। "... তা ছাড়া আরও একটা কারণ আছে। আমাদের দেশে অনেক 'মননশীল' (কী অর্থে মশাই?) গ্রন্থ এমন দুরূহ ও নীরসভাবে (ইচ্ছাকৃত কি?) লিখিত হয়, নিতান্ত দপ্তর পাঠকেরও আয়ত্তের অতীত। বুঝবে বলে তো লেখা। কিন্তু পড়লে যদি পাঠকের ধনুষ্টঙ্কার দেখা দেয়, তবে সে পড়বে কেন? 'মননশীল' গ্রন্থ কি সরস করে লেখা চলে না। দেশী বিদেশী এমন অনেক 'মননশীল' গ্রন্থের নাম করা যায় যা একসঙ্গে 'হিতং চ মনোহারী'। রসাত্মক বাক্য কাব্য, কিন্তু সত্যাত্মক বাক্যকে রসাত্মক হয়ে উঠতে বাধা নেই। না উঠলে বুঝবো ক্ষমতার অভাব, পাঠকের রসোপভোগের নয়, লেখকের রসসৃষ্টির।..."

পড়া এবং বোঝা পাঠকের কর্ম ও কাম্য। পাঠ বিনা বোধ অসম্ভব। পাঠে তৃপ্তি পেলে তলিয়ে বোঝার আগ্রহ বাড়ে। পাঠপ্রহা যদি শিরোনামা দেখে অন্তর্হিত হয়, অনুচ্ছেদের পর অনুচ্ছেদ ক্রমশ যদি পাঠকের ক্লান্তি টেনে আনে, বিষয়বস্তু এবং ভাষা যদি একক-ভাবে জটিলতা এবং যুগপৎ দুরূহতার জট পাকায় তেমন সৃষ্টি নিশ্চয় কোন লেখকের শ্লাঘ্য নয়। তবু আশ্চর্যের কথা পাঠককে দূরে সরিয়ে রাখা প্রবন্ধের সংখ্যা অধিক। শুধু সংখ্যা-গরিষ্ঠতায় বিচলিত হবার কিছু ছিল না যদি না তার তোড়ে সংখ্যালঘিষ্ঠ শ্রেয় প্রবন্ধগুলি ভোটাধিক্যের বিপদ্‌লতায় অপঠিত থেকে যেতে বাধ্য হত। দুর্বোধ্য প্রবন্ধগুলির সঙ্গে হৃদয়-গ্রাহী রচনাগুলিও পাঠকের এক ফুরে মাথা কামায়। পাঠক সুপাঠ্য প্রবন্ধগুলি থেকে দৃষ্টি ফিরিয়ে রাখেন। অন্যদিকে প্রবন্ধকার চক্ষু বুজে পাঠকদের বিমুখতাকে ঔদাসীন্যভরে অগ্রাহ্য করে সাহিত্যক্ষেত্রে গবেষণার মহা গুরুদায়িত্ব সম্পাদন করে চলেন।

উভয় পক্ষ চক্ষু মুদে কাণামাছি পর্যন্ত খেলা চলে না, প্রবন্ধ রচনা বা পাঠ ত কোন ছার।

শঙ্কর গুপ্ত

স মা লো চ না

কবিতার ধর্ম ও বাংলা কবিতার ঋতুবদল ॥ অরুণ ভট্টাচার্য। চার টাকা

কবিতার ধর্ম সম্পর্কে, বিশেষত আধুনিক বাংলা কবিতা সম্পর্কে আলোচনা-গ্রন্থ অতি মুষ্টি-মেয়। অরুণবাবুর গ্রন্থটি সেই হিসাবে উক্ত ক্ষুদ্র তালিকায় একটি মূল্যবান সংযোজন।

উপলব্ধি ও মননের মধ্যে আপাত-বিভেদ থাকলেও উভয়ের মধ্যে যে কোন বিরোধ নেই অরুণবাবু সেকথাই সপ্রমাণ করেছেন তাঁর আলোচ্য গ্রন্থে; যুক্তি ও বিশ্বাসের অভেদ্য নৈকট্য তাঁর আলোচনা-গ্রন্থে তাই স্পষ্ট প্রতীয়মান। অরুণবাবু সুকবি, কবির অন্দরমহলের সংবাদ তাঁর অজানা নয়। কাব্যাত্মার উষ্ণ সাহচর্য তাঁর আলোচনায় তাই সহজেই প্রাপ্তব্য। নানা বিপরীত কোটির বিচিত্রতা পাণ্ডিত্য-সূত্রে গ্রথিত করে সমীকৃত ও স্বীকৃত করে তিনি তাই যা আমা-দের উপহার দিয়েছেন তা নিঃসন্দেহে অভিনন্দনযোগ্য।

গ্রন্থের প্রথমাংশে কবিতার অবশ্যম্ভাবী নানা ধর্মের কথা আলোচনা করা হয়েছে। কয়েকটি অধ্যায়ে বিভক্ত সেই আলোচনা পূর্ণাঙ্গ না হলেও মনোজ্ঞ বলা চলে। মহৎ কবিতার ব্যাঞ্জনা বা চমৎকৃতি ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করা অসাধ্য না হলেও দুঃসাধ্য। অরুণবাবু সেই দুঃসাধ্য কর্ম অতি নিপুণভাবেই পালন করেছেন। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য জগতে আজ পর্যন্ত কাব্য বিষয়ক যে অসংখ্য মতামত প্রচলিত আছে তার মধ্যে থেকে কিছু বেছে নিয়ে কিছু পরিহার করে তিনি নিজস্ব মনোভঙ্গি অনুযায়ী তা প্রকাশ করেছেন। কবিতা সম্পর্কে নানা বিচিত্রতারও সুযোগ তিনি আমাদের দিয়েছেন। বিশেষত, 'কবিতা বিষয়ক প্রস্তাব' অংশে কয়েকটি মৌলিক সমস্যা পাঠকের মনে চিন্তার খোরাক জোগাবে সন্দেহ নেই।

কবিতার জন্মলগ্নে কতখানি ব্যক্তিক অনুভূতি ও কি পরিমাণ সমাজ-চেতনা আছে তা অনিশ্চিত ও অমীমাংসিত। সেই অমীমাংসিত প্রশ্নের পুনর্বিবেচনা করতে গিয়ে অরুণবাবু অনেক নতুন পথের অর্গল উন্মোচন করেছেন। কবিতার ধর্ম আলোচনা প্রসঙ্গে 'কবিতা গান ও কাব্য পাঠ' অনুরূপ পথেরই সন্ধান দেবে। মতদ্বৈধতার অবকাশ থাকলেও এক হিসাবে এই সংক্ষিপ্ত আলোচনাটি দিক্‌দর্শনীর সমতুল্য। 'বাঙলা লৌকিক কাব্য ছড়া ও গান' এবং 'বাঙলা কাব্যে মানবিকতা' প্রসঙ্গে আলোচনাটি বিশেষ মৌলিক না হলেও সুলিখিত। তাঁর কাব্যে রেণাসাঁ-চেতনার বিকাশ, অভিব্যক্তি ও প্রতিক্রিয়া সংক্রান্ত আলোচনাটিও নানা কারণে স্মরণীয়। উপরোক্ত অধ্যায়গুলির তুলনায় 'কবিতার ধর্ম' শীর্ষক অধ্যায়টিই বরং কিঞ্চিৎ সংক্ষিপ্ত ও হীনপ্রভ বলে মনে হল। এই জটিল বিষয়ের আলোচনাটি আরো গভীর হওয়া উচিত ছিল।

আলোচ্য গ্রন্থের দ্বিতীয় পর্বে বাংলা কবিতার ঋতু বদল আলোচনা করা হয়েছে। 'ঋতু বদল' কথাটি বোধহয় লেখক গ্রহণ করেছেন রবীন্দ্রনাথের 'নবজাতক' কাব্যগ্রন্থের ভূমিকা থেকে; উক্ত পুস্তকে 'ঋতু বদল' শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছিল কাব্যাদর্শের আপেক্ষিক পরিবর্তন বুঝাবার উদ্দেশ্যে; অভিধা গত অর্থ যাই হোক না কেন এখানে লক্ষণা বা ব্যঞ্জনার্থই আমাদের গ্রহণ কোরতে হবে। বাঙলা গীতি বা খণ্ড কবিতার পরিবর্তমান আদর্শই যে উক্ত শব্দের অন্বিষ্ট

তা' অরুণবাবু সবিস্তারে আলোচনা করেছেন। রবীন্দ্রনাথকে সীমা ও সুর হিসাবে গণ্য করে বাঙ্‌লা কবিতায় যে আধুনিকতা সঞ্চারিত হয়েছিল তা'র প্রকৃতি যেমন বিভিন্ন তেমনি বিচিত্র; এই আধুনিক সংজ্ঞাটি আবার কালবাচক নয়, গুণবাচক; যুগধর্মের ছাপ এর উৎসারণমূলে থাকলেও কবির স্বকীয় ধ্যান-ধারণা ও প্রত্যয়েই এই কবিতা অধিক চিহ্নিত। এই জাতীয় কবি ও কবিতার স্বরূপ নির্ণয়ে অরুণবাবু প্রশংসনীয় বৈশিষ্ট্যেরই পরিচয় দিয়েছেন বলা চলে।

উত্তর রৈবিক বাঙলা কবিতায় রবীন্দ্রনাথের উত্তরাধিকার অবিস্মরণীয়। রবীন্দ্রনাথের পর জীবনানন্দে এই আধুনিক চেতনা আরো স্পষ্ট উন্মোচিত। জীবনানন্দ ও রবীন্দ্রনাথের কবিতা নানা দৃষ্টিকোণ থেকে আলোচনা করে বাঙ্‌লা সাম্প্রতিক অন্যান্য কবির উপর তাঁদের প্রভাব দেখিয়েছেন অরুণবাবু; জীবনানন্দের স্যুর রিয়ালিস্টিক মনোভঙ্গি, ইমেজ সৃষ্টির তৎপরতা উপমার অনন্যতা সম্পর্কে তিনি যদি আরো সবিস্তারে আলোচনা কোরতেন তবে মনে হয় আলোচনাটি আরো তাৎপর্যপূর্ণ হত। জীবনানন্দের কবিতায় ব্যঞ্জনার দুরূহতা আছে ঠিক কিন্তু তাকে দুরূহতা না বলে গভীরতা বলাই যুক্তিযুক্ত। জীবনানন্দ ইয়েটস্, এলিয়ট কি ভেরলেনের মতই প্রতীক প্রিয়—সুতরাং অরুণবাবু যে তাঁকে 'নির্জন' ও 'দুর্বোধ্য' কবি বলে দোষ দিয়েছেন তা' ঠিক যুক্তিসঙ্গত বলা চলে কি?

অমিয় চক্রবর্তী, বুদ্ধদেব বসু বিশেষত প্রেমেন্দ্র মিত্র সম্পর্কে অরুণবাবুর আলোচনা বিশেষ প্রাজ্ঞ হয়নি। এক হিসাবে ওগুলিকে অসম্পূর্ণও বলা চলে। অমিয় চক্রবর্তীর সমাজ-চেতনা, বলিষ্ঠ আশাবাদ তাঁর আলাপচারি কাব্য-ভঙ্গি কি করে তাঁর দৃষ্টি এড়িয়ে গেল তা' ঠিক বুঝলাম না। প্রেমেন মিত্র সম্পর্কে তাঁর মতামত যথেষ্ট রূঢ় বলে মনে হয়। বিশেষত 'তাঁর হালের কবিতাগুলি কতটা টিকে থাক্‌বে' এ সম্পর্কে তাঁর যুক্তি অস্পষ্ট ও অসম্পূর্ণ। বুদ্ধদেব বসুর সম্পর্কে আলোচনা এতই সংক্ষিপ্ত যে তার অধিকাংশ বৈশিষ্ট্য লেখক আলোচনা করবার অবকাশ পাননি; তথাপি আলোচনাটি স্থানে স্থানে চিন্তার খোরাক জোগাবে। সুধীন্দ্র দত্ত ও বিষ্ণু দে-র কবিতায় বহিরঙ্গে সাদৃশ্য থাকলেও অন্তরঙ্গে তাঁরা যে বিসদৃশ এই প্রভেদটি অরুণবাবু সুন্দর ভাবে বিশ্লেষণ করেছেন; এক হিসাবে তাঁর এই আলোচনাটিই সবচেয়ে পরিণত বলে মনে হল। অজিত দত্ত ও সঞ্জয় ভট্টাচার্যের কাব্যকৃতিও অরুণবাবু আলোচনা করেছেন। আলোচনা রসগ্রাহী ও সুষ্ঠু। অতি বা উগ্র আধুনিক সমর সেন সম্পর্কে তাঁর মতামত কিঞ্চিৎ একদেশদর্শী হলেও যুক্তিনিষ্ঠ।

সর্বশেষে আধুনিক বাঙ্‌লা কাব্যের পশ্চাতে ইংরেজী আধুনিক কবিতার প্রেরণার কথা উল্লেখ না করলে এই জাতীয় আলোচনা অসম্পূর্ণ হতে বাধ্য। অরুণবাবু বিক্ষিপ্ত ভাবে সকল অধ্যায়েই তাই তার অবতারণা করেছেন; শেষে সংক্ষেপে আধুনিক ইংরাজী কবিতার প্রেক্ষিত সম্পর্কে আলোচনাটিও এই প্রসঙ্গে পঠনীয়।

উষারঞ্জন মুখোপাধ্যায়

আপনার 'ছোট-ছোট মালের' জন্য

নতুন ব্যবস্থা

আপনার ছোট-ছোট মাল এখন আমরা
হাওড়া থেকে

ধানবাদ	২য় দিনে
পাটনা জংশন	৩য় দিনে
গয়া	৩য় দিনে
ভাগলপুর	৩য় দিনে

পৌঁছে দেবার ব্যবস্থা করেছি

রেলে মাল পাঠান....তাড়াতাড়ি পৌঁছুবে

এক্সপ্রেস গুডস্ সার্ভিস (ই, জি, এস) এর সুযোগ নিন

বিশদ বিবরণ গুডস্ সুপারভাইজর হাওড়া গুডস্ এর কাছে পাবেন

পূর্ব রেলওয়ে

adarts/ER/2/59